বিনিময় ১৫ টাকা

অধিকার

আগস্ট ২০২২

এই সংখ্যার বিষয়

হেফাজতে এত মৃত্যু!
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে সুকুমার রায়ের খুড়োর কল
"নো এন পি আর" - কোন পথে আমরা
ডানকুনি বিনোদিনী নাট্যমন্দির দখলের চক্রান্ত ব্যর্থ হোক
বিলকিস বানোর গণধর্ষণ ও তার শিশু কন্যা সহ সাতজনের হত্যাকারী সসম্মানে রাষ্ট্রের করুণায় মুক্তি পেল!
তথ্যানুসন্ধান
সংগঠন সংবাদ

সম্পাদনা: পত্রিকা উপসমিতি। গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর (8017437302) কর্তৃক প্রকাশিত ও ভিভিড কম্পিউটার, রিষড়া থেকে মুদ্রিত।

E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকারের জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

হেফাজতে এত মৃত্যু!

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে চারজন যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। চারজনকেই 'সন্দেহজনক ডাকাতি' অর্থাৎ ডাকাতি করতে পারে সন্দেহ করে আলাদা আলাদা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আলাদা আলাদা মামলায়।

অভিযোগ , তাঁদের প্রথমে বারুইপুর এবং মহেশতলা থানায় প্রচণ্ড মারধর করা হয়। পরে জেলের ভেতরে ফের ব্যপক মারধর করা হয়। পরিণতিতে চারজনেরই মৃত্যু হয়। এই চারজন যুবকই ধর্মে মুসলমান হওয়ায় গোটা বিষয়টা একটা আলাদা মাত্রা অর্জন করেছে । জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদিও ব্যাপারটাকে কাকতালীয় বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু গোটা বিষয়টাকে গভীরে অনুসন্ধান করে দেখলে সন্দেহ করার যথেস্ট কারণ আছে যে ধর্মীয় পরিচয় দেখেই বেছে বেছে তুলে এনে পিটিয়ে মারা হয়েছে অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা গুরুতর সাম্প্রদায়িক দিক রয়েছে। এটা আরও জোরদার হয়েছে, একই মামলায় একই সাথে গ্রেপ্তার হওয়া দুই হিন্দু যুবক অক্ষত অবস্থাতেই জামিনে বেরিয়ে আসাতে। এর আগেও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক আচরণের অভিযোগ উঠেছিল। বারুইপুর জেলের ঘটনার কয়েকদিন পরেই কলকাতা পুলিশের অধীন গলফগ্রীন থানাতেও এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। ভারত সরকারের তরফে সংসদে পেশ করা তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে হেফাজতের মৃত্যুর সংখ্যা ২৫৭ জন। হেফাজতে মৃত্যু অর্থাৎ পুলিশ হেফাজত এবং জেল হেফাজত। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয়। প্রথম উত্তর প্রদেশ। এর আগের বছরে এই সংখ্যা ছিল ১৮৭। এক বছরে হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি পরিমাণে বেড়েছে। বিপুল সংখ্যায় হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও সংশ্লিষ্ট থানা বা জেল

কর্তৃপক্ষের কারো তেমন সাজা হয়েছে এরকম ঘটনা কিন্তু খুব একটা জানা যায়নি। বড়জোর দু-চার জনকে সাময়িক ক্লোজ বা বদলি করা হয়। ক্লোজ করার অর্থ সাময়িকভাবে মিডিয়া বা জনসাধারণের নজরে বাইরে রাখা। হৈচৈ থেমে গেলে আবার পুনঃমুষিক ভব! শুধু অন্য কোথাও, অন্য কোন জেল বা থানায়। এই বিপুল সংখ্যক হেফাজতের মৃত্যু নিয়ে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরও তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। জেল হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে তো একেবারেই স্পিকটি নট্। কারণ জেলবন্দীদের ভোট নেই। থানা লকআপে মারা গেলে দু চার দিনের হইচই কোন কোন পার্টি করে থাকে। তারপর আবার অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া। তাও কলকাতা বা কোন বড় শহরাঞ্চল হলে। জেলায় হলে তো সবটাই প্রায় নজরের বাইরে থাকে। ফলে গলফ গ্রীনের মতো কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এরকম ভাবে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটাতে সাহস পায় পুলিশ। এর আগেও সিঁথি থানা, বটতলা থানায় একই ঘটনা আমরা ঘটতে দেখেছি। দেখেছি ধনেখালি ও অন্যান্য থানায়। অভিযোগ উঠেছে বামফ্রন্টের সময়কার টর্চার চেম্বার রিট্রিট বা ওই ধরনের কোন টর্চার চেম্বার ফের চালু করেছে কলকাতা পুলিশ। জেল ফেরত বন্দিদের অভিযোগ, বারুইপুর জেলেও তৈরি হয়েছে 'পেটাই ঘর'। সরকার তথা শাসকদলের প্রশ্রয় তো বটেই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতার কারণেই বারুইপুর জেলে এ ধরনের ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারল জেলা পুলিশ ও জেল কর্মীরা।কলকাতা সহ রাজ্যের পুলিশ ক্রমশই বলগাহীন আচরণ করতে সাহস পাচ্ছে। বছর দুয়েক আগে দমদম জেলে পুলিশ গুলি চালিয়ে ৬ জন বন্দিকে হত্যা করেছিল।বহু বন্দিকে গুরুতর আহত করেছিল। কোন বিচার হয়নি তারও।

এরই পাশাপাশি লক্ষ্য করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারাদেশে আদালতগুলোতে ঝুলে থাকা মামলার সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। এর মধ্যে ৪ কোটিরও বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে নিম্ন আদালতে অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ট্রায়াল কোর্টে। বাকিটা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে। আদালত গুলিতে অসংখ্য বিচারক পদ শূন্য। ফলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। সারাদেশে জেলগুলিতে ৫ লক্ষ জেলবন্দির মধ্যে অন্তত ৭০ শতাংশই বিচারাধীন। এদের অনেকেই গত ১০-১২ বছর ধরে বিচারাধীন অর্থাৎ বিনা বিচারে জেল খাটছে। এই বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে আবার মুসলমান ও দলিত বন্দী সংখ্যায় অধিক। অধিকাংশই নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত। কারো কারো ক্ষেত্রে জেল খাটার সময় সম্ভাব্য শাস্তির চেয়ে বেশি। এদের মধ্যে বহু বন্দি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা মামলায় বছরের পার বছর জেলে আটকে। না এদের বিচার শেষ হয় না হয় এদের মুক্তি। অথচ গোধরাকাণ্ডে বিলকিস বানু মামলায় ধর্ষণ -হত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মুক্ত করা হয় সরকারি উদ্যোগে। এদের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় ! এটাই হলো এ রাজ্য তথা দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ছবি। হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের একটা ভূমিকা থাকার কথা। হেফাজতে মৃত্যু হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমিশনকে জানাতে হয়। এখন এ রাজ্যে কোন মানবাধিকার কমিশন নেই। ফলে কাউকে জানানোরও নেই। সংবিধান স্বীকৃত জীবনের অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার কার্যকরী করার কথা রাস্ট্রের। বিষয়টা বর্তমানে সম্পূর্ণ রাস্ট্রের ইচ্ছাধীন থেকে যাচ্ছে। তাদের ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। না রাজনৈতিক শক্তি না প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি। অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলির উপরই আজ সে গুরুদায়িত্ব বর্তেছে।

সে দায়িত্ব পালনে আরও তৎপরতা, আরও দায়িত্বশীলতা সময়ের দাবি।

পেনশন – এক অন্তহীন প্রতীক্ষা

সাম্প্রতিককালে হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তাঁর পেনশন না পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, যদিও সরকারের পক্ষ থেকে কাজের স্বীকৃতির জন্য তাঁকে "শিক্ষারত্ন" সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল । এই মৃত্যু একটা অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন রেখে যায় পেনশন পাওয়া নিয়ে এই জটিলতা কি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা না কি পেনশন পাওয়ার সামগ্রিক চিত্রটাই এক দীর্ঘমেয়াদি অন্তহীন প্রতীক্ষার বিষয় ! ভারতের সংবিধান অনুযায়ী পেনশন পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার এবং পেনশনের পরিমাণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষটি বৃদ্ধ বয়েসে মর্যাদার সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতে পারেন । পেনশন পাওয়া না-পাওয়ার কয়েকটি ঘটনা সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে পেনশনের অনিশ্চয়তার চিত্রটি পরিষ্কার করে দেয় ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ আসলে সুকুমার রায়ের খুড়োর কল

শুভ্র মল্লিক

সুকুমার রায় তাঁর খুড়োর কল কবিতায় একটি আশ্চর্য কলের উল্লেখ করেন।যেটা খুড়োর কল নামেই প্রসিদ্ধ।কলটি সম্পর্কে বর্ননা করতে গিয়ে লেখেন-

"দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,

ঘণ্টা পাঁচেক ঘাটলে পরে আপনি যাবে বোঝা ।

বল্‌ব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,

ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা ।

সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যে রকম রুচি-

মণ্ডা মিঠাই চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ খাজা কিংবা লুচি ।

মন বলে তায় 'খাব খাব', মুখ চলে তায় খেতে,

মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে ।

এমনি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,

উৎসাহেতে হুঁস্‌ রবে না চল্‌বে কেবল ধেয়ে ।"

অগ্নিপথ নিয়ে আমরা দেখলাম সারা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও জনরোষ। তার ফলে সরকারি সম্পত্তি ও অনেক ক্ষতি হয়েছে।শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা বলেছে এই সরকারি সম্পত্তি ক্ষয় ক্ষতির পিছনে যারা জড়িত তাদের কঠোর শাস্তি দানের কথা। তাহলে এ প্রশ্ন জাগে যারা সরকারি সম্পত্তি বেচলো তাদের কি শাস্তি হবে? শাস্তির প্রসঙ্গ এ বিষয় মহান শাসক শ্রেনী রাখেন না।শুধু সরকারি সম্পদ বিক্রির প্রক্রিয়া চালিয়ে যান।এই পথেই রেল, বিএসএন এল,কয়লাখনি,রেল,বিমান সহ একাধিক সরকারি সেক্টর বেচার পর এখন কেন্দ্রের মোদী সরকারের পরিকল্পনা শিক্ষাকে বেচে দেওয়া।কারন শিক্ষা একটা বড় লাভজনক মাধ্যম ব্যাবসার জন্য।আর ব্যাবসার জন্য প্রচার লাগে। আর সেই প্রচার ই গালভরা প্রতিশ্রুতির আড়ালে করা হলো জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর মাধ্যমে। যা সুকুমার রায়ের খুড়োর কলের মতন কল।জনগনকে মিথ্যা প্রলভন ও চটকদারি বক্তব্যের আড়ালে বিনা প্রতিবাদে নীতি প্রণয়ন করিয়ে নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেচে দেওয়া।এই বর্তমান সরকারের নীতি।

NEP-2020 শিক্ষা নীতির বিপদ

ভারতের জাতি স্বত্বা বিকশিত হয়েছে একাধিক জাতি ও ভাষার সমন্বয়ে। রবীন্দ্রনাথ এর সুন্দর বেখ্যা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়।লিখেছেন," হেথায় আর্য, হেথা অর্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন–/শক-হুন-দলন-মোগল এক দেহে হলননলীন।" ভারতবর্ষ ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিলো।এরপর ৭৫ বছর ব্রিটিশমুক্ত ভারতে নিজস্ব শাসন ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।ব্রিটিশ শাসন থেকে আজ পর্যন্ত ধরলে প্রায় ৩০০ বছর আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া পেয়েছে ভারত।সময়টা খুব কম নয়।এর মধ্যে এসেছে নানা শিক্ষানীতি।তার ক্ষতিকর ও হিতকর উভয় প্রভাব ই আজ ও বিদ্যমান।আর এই সব কিছুর মধ্যে একটা বিষয় বরাবর গুরুত্বপূর্ণ ছিলো শাসকের শিক্ষা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনগনের শাসকিয় সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে প্রতিক্রিয়া।এই উভয় সংঘাতের মধ্যে দিয়েই দীর্ঘ প্রায় ৩০০ বছর ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যাবস্থা বিকশিত হয়েছে,সংস্কার সংশোধন ও চলেছে,চলবেও।এখানে কয়েকটি বিষয় গভীর সমস্যা শুরু থেকেই থেকে গেছে। যেমন -

ধর্ম

ধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাদান ছিলো মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। এটা ব্রিটিশরাও আপন শাসনের স্বার্থে টিকিয়ে রেখেছিলো দীর্ঘদিন। ডিভাইড অ্যান্ড রুল ছিলো তাদেরই সৃষ্ট নীতি। যার সার্থক রুপকার ছিলো দুই ভারতীয় ব্রিটিশদের রক্ষাকর্তা সংগঠন একটা সংঘ পরিবার আর এস এস এবং অপরটি হল মুসলিম লিগ। এরাই ছিলো ব্রিটিশদের কাছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল ইপ্লিমেন্টের তুরুপের তাস । ব্রিটিশ মুক্ত ভারত সরকারগুলো একই কাজ করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহ দিয়েছে বেশি কেউ একটু রেসিস্ট করে শিক্ষা নীতি নিয়ে চলেছে। সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্ত নীতিকে ভঙ্গ করেই এরাই বার বার শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। ধর্মকে শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলার কাজটা অসমাপ্তই থেকে গেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে সহজেই শিক্ষা ব্যাবস্থা ধ্বংসের পরিকল্পনা করতে পারছে মোদী সরকার। এই নতুন শিক্ষানীতিতে ও তার প্রতিফলন ঘটেছে। মৃতপ্রায় ভাষা সংস্কৃতকে সব ক্লাসে পড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। যার বিরোধীতা এক সময় সংস্কৃতের পন্ডিত হয়ে ও ১৫০ বছর আগে বিদ্যাসাগর করে গেছেন। এর পাশাপাশি গীতা পড়ানোর কথা এই বিজেপি সরকারের আমলে বার বার বলা হয়েছে। এই বিজেপি সরকারই মেডিক্যাল শিক্ষা থেকে হিপোক্রেটিক ওথ তুলে দেওয়ার কথা বলেছে। আর এই সবের মধ্যে দিয়ে ইংরেজদের সাজানো বিভেদের পরিকল্পনাকেই ইংরেজ শাসন

মুক্ত ভারতে বাস্তবায়িত করতে চাইছে ইংরেজের দালালি করা বিশ্বাসঘাতক সাভারকারের উত্তরসূরিরা।

উঁচু নীচ বিভেদ

শিক্ষাঙ্গনে উঁচু,নীচু বিভেদের প্রচলন মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। এটা ব্রিটিশ শিক্ষানীতিতেও সুরক্ষিত ছিলো। বাংলায় বিদ্যাসাগর প্রথম এই বিভাজন মেটাতে সদর্থক উদ্যোগ গ্রহন করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় সংস্কৃত কলেজে ভর্তির প্রশ্নে সমস্ত ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে দেন। একই ভূমিকা নিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের জ্যাতিবা রাও ফুলে ও। তিনি ও তাঁর স্ত্রী এই উঁচু নীচু বিভাজনের বিরুদ্ধে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তারপর ও আমরা দেখছি আম্বেদকারকে ও পঠন পাঠনের সময় নানা বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়েছে। ব্রিটিশ মুক্ত ভারতে উঁচু,নীচু বিভেদ মেটাতে শিক্ষাক্ষেত্রে ও নানা প্রচেষ্টা চলেছে। তবে হিন্দুত্ব ও আর্যদের উত্তরসূরি হিসাবে গর্ব করা বিজেপি সরকারের জামানায় আদিবাসী মানুষদের উপর বেড়েছে অত্যাচার। আদিবাসী ছাত্র রোহিত ভেমুলাকে হত্যাও করা হয় এই ষড়যন্ত্রী বিজেপি শাসনে। সাথে মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরেও বিজেপি জামানায় বেড়েছে নিপীড়ন। বেড়েছে সাম্প্রদায়িক হিংসা সৃষ্টির ঘটনাও। বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার ইন্ডেক্সেও ভারত রয়েছে পিছনের দিকে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক নীতির জন্য সারা বিশ্বে সমালোচিত হয়েছে ভারত সরকার বিজেপি শাসনে বিভিন্ন সময়।বিজেপি একথা ভুলিয়ে দিতে চায় ভারতের আদি জনগোষ্ঠী এই আদিবাসীরাই।এই কথা তো বিবেকানন্দ ও স্বীকার করেছে । অথচ বিজেপি এ সত্য স্বীকার করতে চায় না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের অপচেষ্টা করে এবং প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। বরং তারা এ দাবীই বার বার করে আর্যরাই সবচেয়ে উন্নত। অথচ ইতিহাস বলছে আর্যদের সভ্যতা ছিলো গ্রাম কেন্দ্রীক। এর আগে ভারতের পুরানো সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা ছিলো নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। বিজেপির সার্বিক আচরণে এটা স্পষ্ট উঁচু,নীচু বিভেদ সমাধানের প্রচেষ্টা বিজেপি জামানায় আশাহত করার মতনই। তাই শিক্ষা নীতিতে ভেদাভেদ মুক্ত ভারতের শিক্ষাঙ্গন গড়ার যতই প্রতিশ্রুতি থাকনা কেন তার মধ্যে উদ্বেগ থেকেই যায়। আর সমানাধিকারের কথাও তাই বিজেপি সরকার প্রণীত শিক্ষানীতিতে অলীক কল্পনার মতনই শোনায়। বিষয়টা সুকুমার রায়ের খুড়োর কলের মতন।

ভাষা সমস্যা

নতুন শিক্ষা নীতিতে প্রথমে হিন্দিকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে সারা দেশে চাপানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপির নতুন শিক্ষানীতি। পরে দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হবার ফলে একধাপ পিছিয়ে পুরানো শিক্ষানীতি গুলোর মতন হিন্দিকে ঐচ্ছিক করা হয়। এই প্রচেষ্টা ব্রিটিশ মুক্ত ভারত হবার পর থেকেই লাগাতার চলে আসছে সমস্ত সরকার দ্বারা। ভারত হলো বিভিন্ন জাতি ধর্ম এবং ভাষাভাষীর মানুষের সমন্বয়ে গঠিত।বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই ভারতের সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিকে ভাঙ্গার প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ব্রিটিশ শিক্ষানীতিতে ইংরাজীকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ করেই মাতৃভাষাকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পঠন পাঠনের নীতি প্রচলিত ছিলো। কিন্তু ব্রিটিশ মুক্ত ভারতে হিন্দি ভাষাভাষীর অঞ্চলগুলো থেকেই বেশিরভাগ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার ফলে বরাবর হিন্দিকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে চাপানোর প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। রাজীব গান্ধী র সময় শিক্ষানীতিতে ও হিন্দিকে ঐচ্ছিক হিসাবে পঠন পাঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। একই নীতি এবারেও থেকেছে নানা প্রতিবাদের পর। যেখানে ইংরাজিকে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ রেখে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ই বাধ্যতামূলক করা দরকার ছিলো। ইংরাজি বেশি জানার ফলে চীনের তুলনায় ভারতীয়রা আমেরিকা,ইউরোপে কাজ কর্মে অনেক বিষয় বরাবর অগ্রাধিকার পায়। কারিগরী শিক্ষাতে ও বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষার বহু বই ইংরাজীতে লেখা হয়েছে। সেজন্য এই সব বিষয় ভারতীয়দের এগিয়ে যেতে ইংরাজী কে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ করাটা অনেক প্রাসঙ্গিক হতে পারতো। আবার নতুন শিক্ষানীতি তে উচ্চ শিক্ষায় রাশিয়ান ,ফারসি, ইংরাজী সহ একাধিক ভাষা শেখানোর ব্যাবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে সরকার। কারন হিসাবে দেখানো হয়েছে ভ্রমনকে। মানে ঘুরতে যাওয়ার জন্য এগুলো শেখা। কার্যক্ষেত্রে ইংরাজীর প্রয়োজনকে কার্যত অস্বীকার করা হলো এই বক্তব্য দিয়ে।

শিক্ষক নিয়োগ সংকট

শিক্ষক নিয়োগের উপর ব্রিটিশ মুক্ত সমস্ত শিক্ষানীতিতে ই জোর দেওয়া হয়েছে।প্রতিটি জাতীয় শিক্ষা নীতিতেই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে।বিশেষ ভাবে এবারের শিক্ষানীতিতে এই প্রসঙ্গে কোন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আঞ্চলিক শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এছাড়া শিক্ষকদের যথেচ্ছ বদলির প্রক্রিয়া বন্ধ করার বিষয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শিক্ষাঙ্গনের পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে।বিশেষ পরিস্থিতিতে একমাত্র বদলি হতে পারে।এই সিদ্ধান্ত দুটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে।কিন্তু সমস্যার যেয়গা হলো এতো দিন ধরে প্রতিটি জাতীয় শিক্ষানীতিতে এক ই কথা বলা হয়েছে ‘শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা’।কিন্তু বরাবর ই শিক্ষক নিয়োগ পর্যাপ্ত পরিমানে হয়নি।সে বিষয়ে ব্যাপক ঘাটতি আছে।একথা স্বীকার ও করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিতে।তাই সংশয়ের যেয়গা এখানেই আদৌ শিক্ষক নিয়োগ কতটা হবে?নাকি

এখানেও প্রাইভেটাইজেশানের পথে হেঁটে পিপি ই মডেলে শিক্ষক নিয়োগ করবে সরকার!এগুলো নিয়ে ধোঁয়াশা ও সংশয় থেকেই যায় পূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ

প্রতি শিক্ষানীতিতে ই বলা হবে ৬- ১৪ বছর পর্যন্ত একটা শিশুর অবৈতনিক শিক্ষার দায় সরকারের। প্রকৃতপক্ষে এই দায়ের লেশ মাত্র আমরা দেখিনা।বিগত কয়েক দশকে আমরা দেখেছি ব্যাপকহারে বেড়েছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।একদিকে বলা হচ্ছে শিক্ষা সবার সমান অধিকার অথচ বাস্তবপক্ষে দেখা যাচ্ছে গরিবের জন্য শিক্ষা নীতি এক বিত্তবানদের জন্য আর এক।সরকারি স্কুলে ইংরাজী পড়ানো হয় না প্রাথমিকে।কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে গেলে বাবা মা কে ও ইংরাজিতে ইন্টারভিউ দিতে হয়।এই দ্বৈত নীতি কেন?এক দেশ দুই শিক্ষা নীতি?গরিবের জন্য জুটবে এক রকম শিক্ষা ধনীর জন্য আলাদা এই নীতি চলবে কেন?এবারেও শিক্ষা নীতিতে ত্রিভাষায় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।তার মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিষয় সংস্কৃত গুরুত্ব পেলেও ইংরাজী গুরুত্ব পেলো না।বরাবর ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দি বলয় থেকে নিয়মিত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার ফলে হিন্দি আধিপত্যবাদ কায়েমের দূরভিসন্ধি স্পষ্ট রুপে প্রতিভাত হয় শিক্ষানীতি প্রনয়নের প্রশ্নে।এবার ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। দুঃখজনক সেখানে ইংরাজী ভাষার ঠাঁই হয়নি।অথচ বেসরকারি স্কুলগুলো মাতৃভাষাকে ও প্রায় গুরুত্বহীন করে ইংরাজী ভাষার উপর জোর দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে রমরমিয়ে ব্যাবসা।কোন ও নিয়ন্ত্রন নেই এর উপর সরকারের।ইংরাজী শিক্ষার ও যেমন প্রয়োজন আছে তেমন ই প্রয়োজন আছে মাতৃভাষায় শিক্ষার ও।অথচ এই দুই প্রয়োজন একত্রে কোন ও শিক্ষা ব্যাবস্থাতেই পূরন হচ্ছে না।সরকার ইংরাজি না শিখিয়ে ব্যাবসসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুবিধা করে দিচ্ছে।আর অন্য দিকে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো মাতৃ ভাষা ভোলানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।উভয়ের মিশ্রনেই এগোচ্ছে শিক্ষানীতি।আবার প্রতিটি শ্রেনীতে পর্যাপ্ত মূল্যায়ন ও হচ্ছে না সরকারি স্কুলগুলোতে পাশ-ফেল ব্যাবস্থা না থাকায়।অন্যদিকে বেসরকারি স্কুলগুলোতে এগুলো দিব্যি আছে কোন ও বাগবিতণ্ডা ছাড়াই।সরকার অজুহাত দিচ্ছে ছাত্রদের মানুষিক চাপ কমাতেই নাকি এই সিদ্ধান্ত! তাহলে এক নীতি বেসরকারি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না কেন?কেন চাপ কমাতে সরকার নিয়োগের ক্ষেত্রে পাশ ফেল তুলছে না?তখন কেন ইঁদুর দৌড় চালাতে দিতে ইন্ধন দিচ্ছে।এই সব কিছু দেখলে বেশ স্পষ্ট সরকারি শিক্ষানীতি আদতে শুধুমাত্র সাক্ষর করতে শেখানো একটা শিক্ষানীতি হয়ে গেছে।যাতে একজন ছাত্র গ্রেজুয়েট হয়েও চাকরির দাবী না করতে পারে সেই পরিকল্পনা ই করা হচ্ছে সরকারি শিক্ষানীতি দিয়ে।একজন শিশুকে পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরনে ব্যার্থ এই নীতি। সংবিধান ও শিক্ষানীতি স্বীকৃত সমানাধিকারের কথা এখানে প্রতিদিন সরকারি ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে।শিক্ষিত বেকার বানানোই এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য।বিস্ময়কর বিষয় হলো নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে পরিষ্কার ভাবে আলাদা কলাম করে ‘শিক্ষায় বেসরকারিকরন বন্ধ করতে হবে।’আর তার তলায় লেখা হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে জনহীতৈষি কাজে এগিয়ে আসতে প্রাইভেট সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।এর সাথে এও বলা হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষার মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নীতি নিয়ে চলতে হবে।এগুলোর অর্থ কি?এই দ্বীচারিতা কেন?এগুলো দেখে মনে হয় শিক্ষায় ব্যাবসায়ি বিনিয়োগকে জন হিতৈষি কাজ আখ্যা দিয়ে ট্যাক্স ছাড় দেওয়ার দূরভিসন্ধি।মানে শিক্ষা ব্যাবসায় অবাধ লুন্ঠনের রাস্তা পরিষ্কার করা হলো ভাঁওতা দিয়ে।আর শিক্ষার বেসরকারিকরণ করতেই দিনের পর দিন হাজার হাজার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল স্রোতের ধারা মেরে দিতে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ হয় না।মেলে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সাহায্য।আর শিক্ষক কমে গেলে ছাত্র ও কমে।আর সেই সুযোগে এগুলো বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সহজে তুলে দেওয়া হয়।এবার শিক্ষানীতিতে এ কথাও বলা হয়েছে সরকারি স্কুলগুলোর সাথে বেসরকারি স্কুলগুলো যৌথভাবে কাজ করতে পারবে।আবার বাইরের ইউনিভার্সিটি গুলো ও এ দেশের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ক্যাম্পাশ খুলতে পারবে। অর্থাৎ বিদেশে না গিয়েই এদেশে বসেই জুটবে বিদেশি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি।এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই।এম বি বি এস এর পর এম আর সিপি নামক একটি ডিগ্রি প্রচলিত আছে।যদি ও এখন ও সেটা মেডিক্যাল কাউন্সিল স্বীকৃত নয়।এটা বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেই নেওয়া যায়।অতীতে ইংল্যান্ডে গিয়ে এই ডিগ্রি নিতে হতো পড়ে।এখন ভারতে বসেই মেলে এই ডিগ্রি।কোন ও ক্লাস বা ল্যাব করতে হয় না।হাজার হাজার টাকা খরচ করে নিয়ম রক্ষা করে তিনটি পরীক্ষায় বসলেই জোটে এই ডিগ্রি।যারা এদেশে এমবিবিএসের পর এমডি বা এম এস করে না তারা এই ডিগ্রি নিয়ে নিজেদের মাস্টার্সের সমতুল্য দেখিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে জোর কদমে জনগনকে বোকা বানিয়ে।বাইরের ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস এ দেশের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলো সেয়ার করার অর্থ এই ধরনের ডিগ্রি গুলোর রমরমাই বাড়বে অর্থের বিনিময়ে।কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা লাভ অধরাই থাকবে।উল্টে এই ডিগ্রি গুলো এরপর সরকারি স্বীকৃতি পাবে।আর সেটা হলে আর ও কি ভয়ঙ্কর পরিনতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

কর্মমুখী শিক্ষা

কর্মমুখী করার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত শিক্ষানীতিতেও একটা গভীর গলদ তৈরি হয়েছে।যেটা এই শিক্ষা নীতিতে রাখা হয়েছে।

কারণ আমরা জানি কারিগরি শিক্ষা নিয়ে বিশেষ ভাবনা শিক্ষা নীতিতে ব্রিটিশ আমল থেকে স্থান পেলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচুর ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়াররা বেকারত্বের সমস্যায় ভুগছে।ফলে অতীতের কারিগরি শিক্ষানীতি আজকের যুগে দাঁড়িয়ে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।সেজন্য এই নীতির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিলেবাস বদল ছিলো জরুরি।যা আর ও ইন্ডাস্ট্রির উপযুক্ত হতে পারে। মেডিক্যাল শিক্ষার মতন এক্ষেত্রেও ডিগ্রি লাভের পর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা ছাত্রদের সরকারি উদ্যোগে বৃত্তির ভিত্তিতে ৬ মাসের এন্ট্রাশিপ বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন ছিলো সিলেবাসকে আর ও ইন্ডাস্ট্রির উপযোগী করে আপডেট করার ও দরকার ছিলো।কারন এখন চাকরির রেশারেশি এতো হারে বেড়েছে সেখানে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন।আর সেটা না থাকায় অনেকেই শুধু ডিগ্রি নিয়ে চাকরি জোটাতে অকৃতকার্য হচ্ছে।এজন্যে এ বিষয় বৃহৎ পরিবর্তনের দরকার ছিলো।অথচ আমরা শুনেছি বর্তমান বিজেপি সরকার কয়েক বছর আগেও বলেছে ইঞ্জিনিয়ারদের রামায়ন,মহাভারতের কল্প কাহিনী থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবে এমন সব মধ্যযুগিয় হাস্যকর ভাবনার কথা।যেখানে রাবনের উড়ুক্কু রথ দেখে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের শেখানো হবে বিমান আবিষ্কারের কথা,রামের অগ্নিবান থেকে শিখবে মিশাইলের কথা।এরকম সব উদ্ভট দাবীগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা বিজেপি UGC কে দিয়ে চালিয়েছে।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই নীতির বিরোধিতা করেছিলো।আর এই সব উদ্ভট কুসংস্কার আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তা নিয়ে কখন ও একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না।অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আস্থা ভরসা বহুলাংশে ই নিজস্ব চেতনা ও বুদ্ধির উন্মেশে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।বিজেপি সরকারের এই ভ্রান্ত গৈরিক নীতির সমালোচনায় সারা দেশের বিজ্ঞানী মহল সরব হয়েছে বার বার ।কিন্তু তাতে ও অন্ধ হিন্দুত্বের মোহে আবদ্ধ ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারকে নড়ানো যায়নি।এদিকে জীবানু,ভাইরাস নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ প্রদানের কথা বলা হয়েছে করোনা পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে।এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।এছাড়া কৃষি বিজ্ঞানের প্রশ্নে যেখানে জৈব্য সার ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি নিয়ে গবেষণার বিষয় উৎসাহ প্রদান প্রয়োজনীয় ছিলো সেখানে এই কাজটি অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে। যেখানে ভারত এ বছর বিশ্বের পরিবেশ ইন্ডেক্সে সবচেয়ে নীচে স্থান পেয়েছে সেখানে শিক্ষায় পরিবেশ ভাবনার ঘাটতি আগামী দিনে বড়সড় বিপদের সম্ভাবনা উস্কে দেয়।এছাড়া বিকল্প শক্তি নিয়েও গবেষনা বৃদ্ধি বা টেকনিশিয়ান বৃদ্ধির প্রচেষ্টার কথা শিক্ষানীতিতে সেভাবে উল্লেখ নেই। যেটা আজকের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আশু জরুরি ছিলো।এগুলো ছেড়ে দিয়ে সরকার মাধ্যমিক পাশ ছুতোর মিস্ত্রী, রংয়ের মিস্ত্রী তৈরিতে অনেক বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে।

গবেষণা

গবেষণা বিষয় বরাদ্দ যে ভারত সরকার খুব কম করে একথা নতুন শিক্ষানীতিতে স্বীকার করা হয়েছে।আবার করোনা উত্তর সময় ভাইরাস,ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষনার প্রয়োজনীয়তা ও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।কিন্তু গবেষনার উন্নতি নিয়ে সদর্থক প্রয়াসের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে।আমেরিকা সহ উন্নত দেশগুলোর তুলনায় গবেষনায় ভারতে বরাদ্দ যে অনেক কম সে কথা ও স্বীকার করা হয়েছে শিক্ষানীতি ২০২০ তে।একথা অস্বীকার করার কোন ও উপায় নেই গবেষনার অভাব ই ভারতকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে।শুধু ভাষন,মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর দূর্নীতি দিয়ে কখন ও ভারতীয় শিক্ষা ব্যাবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।হিসাব করলে দেখা যাবে বছরে জিডিপির যত পরিমান অর্থ নেতা মন্ত্রীদের বিলাসিতা ও দূর্নীতিতে সরকার ব্যায় করে থাকে সেই পরিমান অর্থ ও যদি শিক্ষা খাতে ব্যায় হতো তাহলেও এ দেশের গবেষনা ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারতো। দুঃখজনক ভারতীয় শাসন ব্যাবস্থা এই কাজটা করার বদলে শিক্ষাকে বেচে দিয়েই নিজেদের দায় সেরে খান্ত হচ্ছে।আর শিক্ষা না থাকায় অন্ধ ভক্তের দল দেশের সর্বনাশকেই দেশের বিকাশ হিসাবে উদযাপন করছে।

শিক্ষানীতিতে মূল্যবোধ

স্বাধীন ভারতে সমস্ত শিক্ষানীতিতে ই মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে।এবার ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি।উল্টে এবার ট্যাগ লাইন করে বলা হয়েছে ‘এক ভারত,অখন্ড ভারত’।কিন্তু ভারত আজ এক কোথায়?শিক্ষায় অবাধ বেসরকারিকরণ ভারতকে দ্বীবিভক্ত করে দিয়েছে।এক দিকে আছে গরিবের দল আর এক দিকে বড় লোকি চাল।তাহলে অখন্ড ভারত কি করে হল?একদিকে আমরা দেখি গরিব বাবা নিজের জমি বিক্রি করে নিজের ছেলেকে পড়াচ্ছে।আর অন্য দিকে দেখি দূর্নীতিগ্রস্থ নেতা মন্ত্রী ভারতের জিডিপির অর্থ নয় ছয় করছে।

ভার্নন গঞ্জালেস সহ ভীমা কোরেগাঁও মামলার সমস্ত রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে

যে অর্থ বহু পরিবারে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারতো সেই অর্থ নষ্ট হচ্ছে।এই মূল্যবোধ শিখবে ভারতের ছাত্ররা! এটাই কি অখন্ড ভারত? সর্বপরি ভারতের ভাষা ধর্মের বিভিন্নতা ও তাকে মর্যাদা দেওয়ার প্রশ্নেও এক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় জাতীয় স্বত্বার বৈচিত্র্যকে আহত করে।

তথ্য সূত্র - Wikipedia, NEP2020, EP1986, কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট

"নো এন পি আর"- কোন পথে আমরা?

অর্ঘ্য মিত্র

"এন আর সি" ও "সি এ এ" কার্যকারী করায় এন পি আর গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ধাপ। তাই, এন আর সি ও সি এ এ বিরোধিতায় "নো এন পি আর" এক জ্বলন্ত শ্লোগানের রুপ নিয়েছে।এবার বিষয় হোল "No NPR, No NRC, No CAA" দাবির আন্দোলনে প্রথম সংঘাত NPR এর সঙ্গে। NRC ও CAA19 এর রুল এখনও তৈরি হয় নি। আমরা জানি যে NPR এর আইনি বৈধতা The Citizenship Act 1955 ও The Citizenship Rules 2003 থেকে এসেছে। এবং ২০১০ সালের হাউস লিস্টিং ও হাউসিং সেনসাসের সাথে প্রথম NPR এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর পর, অসম ও মেঘালয় বাদে ২০১৫-২০১৬ সালে তা আপডেট করা হয় । বর্তমানে, বিলম্বিত সেনসাসের সাথে NPR এ সংগৃহীত তথ্য আপডেট করার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতের ইউনিয়ন (কেন্দ্রীয়) সরকার। নাগরিকদের রাষ্ট্রহীন করার ষড়যন্ত্র ও বৃহৎ পুঞ্জির স্বার্থে আধুনিক দাস প্রথায় শ্রমিক জোগানের লক্ষ্যে দেশের আইন সভায় বিগত বহু দশক ধরেই শাসক কুল নাগরিকত্ব আইনে জন বিরোধী সংশোধনী এনে চলেছে যা কার্যত দেশের কোটি কোটি মানুষ কে রাষ্ট্রহীন করে রেখে দেওয়ার অমানবিক পরিকল্পনা।

সরকারি ঘোষণায় ১১৯ কোটিরও বেশি মানুষের (usual residents) NPR এর তথ্য ইতিমধ্যে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংগ্রহিত হয়ে আছে। সাধারণ মানুষের জটিল আইনি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কে কাজে লাগিয়ে সরকার ইতিমদ্যে এন আর সি রুপায়নের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে, সেনসাসের সাথে এই তথ্য আপডেট ও নতুন অন্তর্ভুক্তির

কর্মসূচি:

১। Verifying, modifying/ correcting the existing NPR database

২। Collecting Aadhaar no from each resident voluntarily.

৩। Collecting Mobile number,Election Photo Identity Cards (EPIC) or Voter ID Card number, Indian Passport number and Driving License number, if available with the residents.

৪। Inclusion of all new resident(s)/ new household(s) found in the local area… (1.6-1.10)

যে ১১৯ কোটির অধিক সংখ্যক লোকের ইতিমধ্যে NPR এ তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের একটি সিরিয়াল নম্বর রয়েছে।উক্ত সিরিয়াল নম্বরের অধীনে প্রাক মুদ্রিত তথ্য থাকবে (পূর্বে সংগ্রহ করা) NPR বুকলেট এ বা মোবাইল এপ এ।নতুনদের নতুন সিরিয়াল নম্বর হওয়ার কথা। অর্থাৎ মৌলিক NPR এর কাজ সিজ্ঘ ভাগ হয়ে আছে।

এমত অবস্তায় "No NPR" বলতে আমরা কী বুঝবো!এবং NPR বিরোধী আন্দোলন কোন পথে?

১। বিভিন্ন সংগঠন/ ব্যাক্তি/ সমষ্টি-র পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী,মুখ্যামন্ত্রী দের NPR কে বাতিল করার দাবিপত্র দেওয়া। ব্যাক্তিগত ভাবে এমন দাবি গণ হারে পেশ করা। স্থানীয় ভাবে পঞ্চায়েত,প্রধান,কাউন্সিলর,বি ডি ও, এস ডি ও, ডি এম কে এই মর্মে বিরোধিতা জানিয়ে দাবিপত্র দেওয়া।

২। যেহেতু, NPR একটি আইনি প্রক্রিয়া এর বিরোধিতা মানেই আইন অমান্য করতে হবে। সাথে অসহযোগ। এই বিশাল ভারত ভূখণ্ডে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজন বিভিন্ন ভাষা ও রাজ্যে এই বার্তা পৌছনো। এবং এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

৩। আন্দোলন কালীন সমস্যা মোকাবেলায় সাথীদের পাশে দাঁড়ানোর পূর্বপ্রস্তুতি। যেমন, আর্থিক, আইনি ইত্যাদি সহযোগিতা।

৪। NPR এর বিশেষ দিক গুলি জন সমক্ষে তুলে ধরা ও সচেতন করা।যেমনঃ

অ। নাগরিকতা প্রসঙ্গ ব্যাতিরেকে এর কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। সেনসাস ও NPR আলাদা।

আ। যেহেতু জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকার ক্রমে হরণ করা হয়েছে NPR এ তাই বিশেষ করে সকলের (পিতা,মাতা,সন্তান সহ এক পরিবারে থাকা সকলের) জন্মের তারিখ ও জন্ম স্থান কে নথিভুক্ত করার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে-সে তথ্য অনুযায়ী আগামী তে NRC ও CAA19 কার্যকারী করার পরিকল্পনা।

ই। সরকার নিজেই স্বীকার করছে যে NPR তথ্য নথিভুক্তিকরণ একটি বিষয়ীগত প্রক্রিয়া।এমত অবস্থায় নাগরিকত্বের অধিকারের মত এক মৌলিক অধিকারকে অপরের খামখেয়ালির ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না।উদাহরণ স্বরুপ আমরা অসমের অবস্থা দেখতে পারি- ১৯ লক্ষের ওপর মানুষকে রাষ্ট্রহীন করা এবং ২৮ লক্ষের অধিক আধার কার্ড লক হয়ে থাকা।১৬০০ কোটি সরকারি টাকা ও জনগনের আরো কোটি কোটি টাকা ও শ্রমদিবস নষ্ট করার পরেও

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুনরায় NRC করার দাবি ওঠার নমুনা আমদের চোখের সামনেই রয়েছে। গণনাকারী ও পরিদর্শক দের প্রতি সরকারের দেয়া নির্দেশিকাঃ "*The degree of accuracy of filling up of the NPR data during the enumeration largely depends on the interest taken by you in following the instructions contained in this manual.*"(3.14e)

ঈ। NPR এ চাওয়া তথ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যাক্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় তার নাগরিকত্ব। এটি ব্যাক্তির দাবি অনুসারে নথিভুক্ত হওয়ার কথা কোন প্রকার প্রমাণপত্র ছারাই।তবে এতে ব্যাক্তির কোন অধিকার জন্মায় না। "*Nationality recorded is as declared by the respondent. This does not confer any right to Indian Citizenship*" (Q.7i). বস্তুত এটি একটি ফাঁদ। ব্রিটিশ ভারত ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়ায় বহু কোটি মানুষ ছিন্নমূল হয়।এ বিভীষিকার অভিজ্ঞতা ও পরিণাম বহন করে চলেছে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ আজও। NPR এ ঘোষিত নাগরিকত্ব অনুসারে পরবর্তিতে তা NRC অথবা CAA19 এর এক্তিয়ার ভুক্ত হবে।এবং নাগরিকত্বের ঘোষণা অনুযায়ী কোটি কোটি মানুষ বে আইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি ভারতিয় নাগরিক হিসেবে নিজেকে দাবি করেন তাহলে বংশগত জন্মের প্রমাণের নথী উপস্থাপনা করতে হবে NRC তে।আর যদি পাকিস্থান বা বাংলাদেশ থেকে আগত বলেন তাহলে আপনি স্বঘোষিত অনুপ্রবেশকারী বা "illegal migrant"। একই অঙ্গে বলা আছে: "*She/He can be penalised for giving any false information*".

উ। NPR এর তথ্য প্রদানকারীর/ উত্তরদাতার সই অথবা আঙ্গুলের ছাপ নেওয়ার নির্দেশিকা রয়েছে- যা সেনসাসের তথ্য নিতে প্রয়োজন হয় না।

ঊ। ইংরাজি (গ্রিগোরিয়ান) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কেউ যদি কোন প্রকারে সঠিক জন্মের তারিখ,মাস ও সাল না বলতে পারে তবে তাদের জন্য অন্য সহযোগী আনুমানিক উপায়ন্তর বলা আছে – ধর্মীয় অনুষ্ঠান,ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি। এ বিষয়টি কয়েকটি শ্রেণী বিভক্ত যেমন, ইংরাজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নয় তবে লোকাল ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জন্মের সাল-মাস-তারিখ জানা আছে, শুধু জন্মের সাল জানা আছে, জন্মের সাল জানা নেই তবে কত বছর অতিক্রান্ত করেছে তা জানা আছে,না জন্মের তারিখ জানা না বয়েস জানা। এ বিশাল দেশে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃরিতিক, ভৌগলিক ও অন্যান্য কারণে কত কোটি মানুষ যে আনুমানিক জন্ম তারিখ ,মাস ও সাল পাবে কে জানে?তার ওপর বিশেষত ইসলাম ধর্মালম্বিদের জন্য সহযোগী ধর্মীয় আনুমানিক উপায়ন্তর বলে কিছু নেই।২০১০ সালের এন পি আর ম্যানুয়ালেও তা ছিল না।

সুত্র: Instruction Manual for Updation of National Population Register (NPR) 2020 for Enumerators & Supervisors.

ডানকুনি বিনোদিনী নাট্যমন্দির দখলের চক্রান্ত ব্যর্থ হোক

১৯৭২ সালে স্থাপিত শিল্পীমন নাট্য গোষ্ঠীর উদ্যোগে নাট্য সম্রাঙ্গী বিনোদিনীর নামে উৎসর্গীকৃত ডানকুনি বিনোদিনী নাট্যমন্দির। এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পীঠস্থান। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নামী অনামী নাট্যগোষ্ঠী সবাই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। ৫০ বছর অতিক্রম করা মঞ্চ ২৯১৮ সালে সৎসঙ্গের অসৎ উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ পথ কে খুঁটি বাঁশ টিন দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৫২ সালে কোলকাতায় শিল্পীমন নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম। ১৯৬২ সালে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। ১৯৬৪ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথম নাট্যমেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে নিয়মিত 'ঘুম নেই' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে চলতে থাকে। ১৯৭০-৭১ সালে 'ঘুম নেই'নাটক বন্ধ করে দেবার পর, শিল্পীমন নিজেদের মঞ্চ তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। মনকোটি নটী বিনোদিনী নামে তাঁর স্মৃতির সম্মানার্থে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বাংলার তৎকালীন নাট্য জগতের সম্রাঙ্গী বিনোদিনী শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই সমাজ কোনোদিনই তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয় নি, চিরকাল উপেক্ষা ও বঞ্চিত করে রেখেছিল। গোঁড়া সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা বিনোদিনীকে কথা দিয়েও যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দিতে পারেননি। অভিমানে নাট্য মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে একাকিত্বের ঘরবন্দী জীবন কে বেছে নেন। শিল্পীমন, ৫০ বছর পূর্বে ১০৭২ সালে নটী বিনোদিনীর বঞ্চনার প্রতিস্পর্ধায় তাঁর স্মৃতির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা সহকারে নাট্যমঞ্চের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে এক ব্যাতিক্রমী পদক্ষেপ, কেন না আজও পশ্চিমবঙ্গে কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য বিনোদিনীর নামে কোনো মঞ্চ স্থাপিত হয় নি।

১৯৭০ দশকের শুরুতে শিল্পীমন তথা বিদ্যুৎ বসুর উদ্যোগে তাঁর তিন সহযোদ্ধা শঙ্কর বসাক, তরুণ ভট্টাচার্য ও গঙ্গা নারায়ণ মুখার্জী সম্মিলিত ভাবে ডানকুনিতে জমি কিনে মঞ্চ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজেদের সঞ্চয়ের দান, যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ এবং ডানকুনির সমাজ সচেতন মানুষ, নাট্য কর্মীদের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ১৯৭২ সালে মঞ্চ গড়ে ওঠে। ঐ বছর ৬ই অক্টোবর মহালয়ার দিন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা উৎপল দত্ত কে দিয়ে নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করানো হয়।

অপরদিকে ১৯৯৯ সালে আরতী রানী শীল সৎসঙ্গ কে

জমি বিক্রি বা দান করার পর সৎ আশ্রম, নাট্যমন্দিরের উত্তরপূর্ব প্রান্তে গড়ে ওঠে।যার পাঁচিল দ্বারা সীমানা নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৭২ সালে বিনোদিনী নাট্যমন্দির হওয়ার পর থেকে ডানকুনির সাধারণ মানুষ দেখতে অভস্থ ছিল যে উত্তর দিকের টি.এন.মুখার্জী রোড থেকে ৮/১০ ফুট রাস্তাটি আছে তা মঞ্চে এসে শেষ হয়েছে। মঞ্চের প্রবেশ দ্বারের সামনে উত্তরপূর্ব দিকে ফাঁকা জমি। পূর্ব দিকে সৎ সঙ্গের পাঁচিল দেওয়া সীমানা। সৎ সঙ্গের ভক্তরা বল খেলা মাঠের উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে অভস্থ ছিল।

বাঁশ, কাঠ,শালবল্লা ও টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি মঞ্চ বেশ কিছুদিন পর প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। কিন্তু ২০১৩ সালে নটী বিনোদিনীর স্বার্ধশত জন্মবর্ষে আবেদনের ভিত্তিতে মাননীয় শ্যামল চক্রবর্তীর সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল এর ৮ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যায়। ২০১৫ সালে মঞ্চের সমস্ত নথি প্ল্যান জেলা ও মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর ডানকুনি পৌরসভার তত্বাবধানে কাজ শেষ হয়। ২০১৬ সালে মঞ্চের মঞ্চের প্রবেশদ্বারের সামনে বিনোদিনীর মর্মর মূর্তি বসানো হয়। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু।

বিনোদিনী নাট্য মন্দিরে শুধুমাত্র শিল্পীমনের ই নাটক মঞ্চস্থ হতো না , এই মঞ্চে বিভিন্ন নাট্য গোষ্ঠী তাদের নাটক , নাট্য প্রতিযোগিতা কখনো নাট্য উৎসব ও করতে অভস্থ ছিল। শুধু নাটকে সীমাবদ্ধ নয় ,প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল , ডানকুনির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন তাদের কর্মকান্ডের স্বার্থে মঞ্চকে ব্যবহার করতেন।বিভিন্ন ধরণের স্কুল গুলো এই পরিক্রমায় একই ভাবে নাট্য মন্দিরকে কাজের মাধ্যম হিসাবে দেখতেন। এখানে না থেমে ,সামাজিক অগ্নিগর্ভ সময় ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গা বা ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে প্রতিবাদে ডানকুনির জাগ্রত বিবেক কে জনমানসে ছড়িয়ে দিতে মঞ্চ থেকে উদ্যোগী হয়ে শিল্পীমনের প্রাণপুরুষ সমাজ সচেতন বিদ্যুৎ বসুর প্রচেষ্টা মঞ্চের কর্মসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত কাজ ব্যাহত হওয়ার ফলে স্বভাবতই মঞ্চের কর্মকান্ড ও বন্ধ হওয়া ব্যতিক্রম ছিল না। তার আগে দুটি ঘটনা প্রকাশ্যে দেখতে পাওয়া যায় ,১.মঞ্চে প্রবেশের মূল রাস্তাটি কোনো অদৃশ্য শক্তির মদতে এই শতকের কোনো এক সাল নাগাদ ডানকুনি শ্রী রামকৃষ্ণ শিশুতীর্থ স্কুলের প্রধান ফটকের জন্য ব্যবহার হতে থাকে। পূর্বে সতী মন্দিরের পাশ দিয়ে স্কুলের যাতায়াতের রাস্তা ছিল। ২. সৎসঙ্গের পশ্চিমের সীমানা, যা মঞ্চের উত্তরপূর্বের সীমানা যেখানে সঙ্গ হঠাৎই লোহার গেট যাতায়াতের জন্য তৈরি করে। সৎসঙ্গ ২০১৭ সালে পত্র মাধ্যমে মঞ্চ কে তার নিজস্ব সীমানার পাঁচিল অপসারণের আবদার করেন। ০৯.০৩.২০১৭ তারিখে ডানকুনি পৌরসভা উভয়পক্ষকে নিয়ে সভা করে। সৎসঙ্গের বক্তব্যবক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে , উভয়পক্ষ সমস্ত নথি তথ্য নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেবে। মঞ্চের পক্ষে সমস্ত নথি তথ্য ১৬.০৭.২০১৭ তারিখে জমা দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ডানকুনি পৌরসভা রহস্যজনকভাবে নীরব হয়ে যায়। পরিণতি এটাই হয় যে ,২৪.০৭.২০১৮ তারিখে সৎসঙ্গ অসৎ উন্মাদনায় মঞ্চের তৈরি উল্লিখিত জমির পাঁচিল ভেঙে ইটগুলো লুঠ করে নিয়ে যায়। ২০২২ সালে প্রশাসন কে জানানোর পরও সৎসঙ্গ ধারাবাহিকভাবে মঞ্চের প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।অবশেষে অসৎ উন্মাদনায় এবং অদৃশ্য শক্তির মদতে মঞ্চের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করা হয়।

এই ঘটনারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দুটি কনভেনশন মঞ্চ আহ্বান করে। প্রশাসনের সমস্ত স্তরে প্রথানুযায়ী পদক্ষেপের পর আইনি লড়াইয়ের রাস্তায় যেতে বাধ্য হয়। ২৯.০৫.২০২২ তারিখে দ্বিতীয় কনভেনশন এর পর মঞ্চের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষর সহ একটি স্মারকলিপি অফিস আধিকারিক , ডানকুনি থানা কে জানিয়ে ,জেলা ও এলাকার প্রশাসনকে প্রতিলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বিলকিস বানোর গণধর্ষণ ও তার শিশু কন্যা সহ সাতজনের হত্যাকারী সসম্মানে রাষ্ট্রের করুণায় মুক্তি পেল!

সোমনাথ বসু

...দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;

বলো 'ক্ষমা করো ' ------

হিংস্র প্রলাপের মধ্যে

সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।।

আফ্রিকা, রবীন্দ্রনাথ

আসুন, করজোড়ে দাঁড়াই গুজরাটের ঐ মানহারা মানবী বিলকিস বানোর সামনে। নতজানু হয়ে।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগে যার নিজের চোখের সামনে আছড়ে মেরে ফেলা হয়েছে তার শিশু কন্যাকে। তার চোখের সামনে যার মাকে গণধর্ষণ করার পর

ধারাল অস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছে সংখ্যাগুরু জল্লাদ বাহিনী। সেই সময় মানে 2002 সালের মার্চ মাসের সেই অভিশপ্ত গুজরাটে একুশ বছরের বিলকিস বানো যে ছিল তখন পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা পালাচ্ছিল পরিবারের লোকদের সঙ্গে একটুকরো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। দু'দিন আগে গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা গুজরাট রাজ্য জুড়ে তখন চলছে একতরফা গণহত্যা, গণধর্ষণ,লুণ্ঠন, একটা সম্প্রদায়কে পরিকল্পনা মাফিক শেষ করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদতে ধর্মীয় ঘাতক বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব।

দাহোড় জেলার রাধিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা বিলকিস বানো। পালাচ্ছিল তারা। সপরিবারে। বিলকিসের স্বামী ইয়াকুব রসুল,মা,আরো অনেক আত্মীয় বন্ধুও ছিল সেই দলে। পথের মাঝেই তারা ধরা পড়ে যায়।যাদের হাতে ধরা পড়ে তারা সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। অনেকেই অনেক দিনের চেনা। প্রতিবেশী। কেউ কেউ বিলকিসদের কাছ থেকে দুধ নিত। তারা উন্মত্ত স্লোগান দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে ছিল সম্পর্কে দাদাএবং ভাই,কাকা এবং ভাইপো। তারা সবার চোখের সামনে একের পর এক নারীদের গণধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। সাড়ে তিন বছরের কন্যাটিকে আছাড় মেরে হত্যা করতেও তাদের হাত কাঁপে না। একুশ বছরের বিলকিস, পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস,গণধর্ষিতা বিলকিস চোখের সামনে নিজের সাতসাতজনকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় একের পর এক খুন হতে দেখে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে। উন্মত্ত পিশাচেরা তাকে মৃত ধরে নিয়ে ফেলে রেখে যায়। জ্ঞান ফিরলে কোনমতে থানায় পৌঁছে অভিযোগ জানালেও সেই সময়ের গুজরাটের পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে না। তাকে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

বিলকিস অদম্য সাহসে লড়াই চালিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক বহু মানুষ তার পাশে দাঁড়ায়। তাদের ঠিকানা হয় ত্রাণশিবির। সবাই জানে গুজরাট পুলিশের হাতে থাকলে এই মামলার পরিণতি কী হতে পারে। এমনকি গুজরাট রাজ্যেও কি এইরকম মামলায় নিরপেক্ষ বিচার আশা করা সম্ভব?

কাজেই গুজরাট পুলিশের ওপর ভরসা না রেখে 2004 সালে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে CBI কে মামলার ভার দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়,গুজরাট রাজ্যে এই মামলার বিচারই হওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে সুপ্রীমকোর্ট মামলাটি মহারাষ্ট্রের বোম্বাই বিশেষ CBI আদালতে মামলাটি স্থানান্তরিত করে। 2008 সালে মহারাষ্ট্রের বিশেষ CBI আদালত মোট এগার জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। 2018সালে বোম্বে হাইকোর্ট এই রায়কে Uphold করে। 2019সালেসুপ্রীমকোর্ট বিলকিস বানোকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে সরকারকে নির্দেশ দেয়। **বোম্বে হাইকোর্টের observation এর কিছু অংশ:**

...পান্নিভেলের কাছে দুটো সাদা গাড়িতে চেপে জনা পঁচিশেক লোক আসছিল। বিলকিসদের পালাতে থাকা দলটাকে দেখে তারা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে। "মুসলমানো কো মারো" স্লোগান দিতে দিতে তারা ওদের তাড়া করে। তাদের হাতে ছিল তরোয়াল, লাঠি,কাস্তের মতো ধারাল অস্ত্র। এক থেকে বার নম্বর পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিলকিস সনাক্ত করতে পারে। চার নম্বর অভিযুক্ত--- শৈলেশ চমনলাল ভাট বিলকিসের কন্যা সালেহাকে মার কোল থেকে টেনে মাটিতে আছাড় মেরে মেরে ফেলে।

এক নম্বর অভিযুক্ত---যশবন্ত চতুর্ভাই নাই হাতের তরোয়াল দিয়ে বিলকিসকে কাটার জন্যে তরোয়াল চালায়। বিলকিস বাঁচার জন্যে বাঁহাত তুলতে হাতে তলোয়ারের কোপ পড়ে।

অভিযুক্ত নম্বর এক, দুই,তিন তার গায়ের পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে একের পর এক তাকে ধর্ষণ করে। প্রথমে এক নম্বর অভিযুক্ত যশবন্তভাই চতুর্ভাই নাই তারপর দ্বিতীয় অভিযুক্ত গোবিন্দ ভাই নাই তারপর তৃতীয় অভিযুক্ত নরেশ মোধিয়া পরপর তাকে ধর্ষণ করে।

ততক্ষণে পাঁচ থেকে বার নম্বর অভিযুক্ত রা আর সব মহিলাদের উলঙ্গ করে, ধর্ষণ করে, পুরুষদের ওপর আক্রমণ করে।

বিলকিস অত্যাচারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখে তার সঙ্গীরা সবাই মরে পড়ে আছে। এমনকি সামিমের বাচ্চাটা পর্যন্ত....অপরাধীরা জেলে যাওয়ার পর বিলকিসরা নিজেদের গ্রামে ফিরেছিল। স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবে গুজরাট সরকার অমৃত বিলিয়েছেন সেই ধর্ষক আর খুনীদের। জঘন্য অপরাধীরা শুধু পনেরোই আগস্ট কারাদণ্ড থেকে ছুটকারা পেয়ে মাথা উঁচু করে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে তাই নয়। তাদের বীরের সম্মান দিয়ে ফুলমালা আর মিষ্টি দিয়ে বরণ করাও হয়েছে। আর আতঙ্কে ঘর ছাড়া শুরু হয়েছে রাধিকাপুর গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষদের। জল্লাদরা ফিরে আসছে। কারণ, সামনেই গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন। সংখ্যালঘু মানুষদের আবার ঠিকানা হতে চলেছে দেবগড় বাড়িয়া তালুকের রাহি-মাবাদ ত্রাণ শিবির।

তাদের অভিজ্ঞতা আছে প্যারোলে বাইরে বেরিয়ে এরাই এর আগে ভয় দেখিয়েছে সাক্ষীদের। কীভাবে গণধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত রা জেলমুক্ত হতে পারে তা ভেবে বিস্ময়ে ও আতঙ্কে হতবাক ত্রাণশিবিরে ত্রাসে সিঁটিয়ে থাকা মানুষগুলো। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধকারী এই এগার জনের মুক্তি অবশ্য ই কোনো পরিকল্পিত চক্রান্তের ইঙ্গিত। কারণ অপরাধটি ও কোন বিচ্ছিন্ন একক অপরাধ ছিল না।একটি গোটা সম্প্রদায়কে নিকেশ করে দেওয়ার চক্রান্তের তা ছিল একটি অংশমাত্র। 2002সালের গুজরাটে সেই ভয়াবহ সময়ে বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে

নয়টি সংঘঠিত গণহত্যার একসঙ্গে তদন্তের ভার সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে CBIকে দেওয়া হয়েছিল। এবং তদন্তের ফলে বহু জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বিলকিস বানোর মামলা এই রকম তদন্তের ই একটি নমুনা। ঐ শাস্তিপ্রাপ্ত এগার জনের মধ্যে একজন সাজা মকুবের জন্যে গুজরাট সরকারের কাছে আবেদন করে। গুজরাট হাইকোর্ট 2019 সালে জানিয়ে দেয় যেহেতু এই মামলার বিচার ও সাজা মহারাষ্ট্রের আদালতে হয়েছে তাই এদের মুক্তির ব্যাপারে গুজরাট সরকারের কিছু করার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে যা করবার করতে পারে মহারাষ্ট্র সরকার। সুপ্রীমকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই বছর অর্থাৎ 2022এর 13ইমে এক রায়ে গুজরাট হাইকোর্টের রায় বাতিল করে দিয়ে বললেন গুজরাট সরকার এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে কিভাবে এই অপরাধীদের মুক্তি ত্বরান্বিত হচ্ছে তা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এমনকি এই রায় দেবার সময় দুজন বিচারপতির বেঞ্চ বিস্মৃত হলেন সুপ্রীমকোর্টের ই 2015 সালের পাঁচ বিচারপতির (তার মধ্যে তৎকালীন প্রধান বিচারপতিও ছিলেন) বেঞ্চের রায় যেখানে বলা হয়েছিল CBI ইত্যাদি জাতীয় সংস্থার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দের ছাড়ের ব্যাপারে যে কোনো সিদ্ধান্ত ঐ সংস্থাগুলির অনুমতি ছাড়া নেওয়া যাবে না। এবং সাজা মকুবের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের রাজ্যসরকারগুলির প্রতি 2014 সালের নির্দেশ আছে যে ধর্ষণ ও গণহত্যার ক্ষেত্রে সাজা মকুব করা যাবে না। এক্ষেত্রে কী হয়েছে? সাজা মকুবের আবেদন তো করেছিল মাত্র একজন।এগারজনকেই ছেড়ে দেওয়ার কথা উঠল কোথা থেকে? কেন? সাজা মকুব করার বিবেচনার কমিটিতে থাকা গোধরার বিজেপি সাংসদের সুপারিশ প্রণিধানযোগ্য -----এরা ব্রাহ্মণ এবং সংস্কার মেনে চলেন। না বলা কথাটা হল খুন ই করুন আর ধর্ষণ ই করুন ওরা তাদের ধর্মমত অনুযায়ীই করেছে। তার মানে সংবিধানে যে ধর্ম -বর্ণ-জাতি-জাত-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের গ্যারাণ্টি দেয় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল।অমান্য করা হল সংবিধান ,সভ্য সমাজের রীতি। অস্বীকার ও অপমান করা হল মানবতাকে।এবং আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে এই দৃষ্টান্তের পথ বেয়ে অপরাধীদের সাজামকুবের তালিকা দীর্ঘ হবে।দীর্ঘতর হবে আক্রান্ত,ধর্ষিত লুণ্ঠিত মানুষদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবার তালিকা। অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত বিলকিসদের পরিবা, আত্মীয়স্বজন,সম্প্রদায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কি কোনও জবাব আছে?

তথ্যানুসন্ধান :

১) বিএসএফ'র গুলিতে কৃষক হত্যা :

মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী গ্রাম রামনারায়ন পাড়া। প্রায় ৮০০ ঘরের বাস। সীমান্ত অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় কিমি ভেতরে। এই গ্রামের ২৬ বছর বয়সের এক কৃষক রুহুল মন্ডল'কে BSF গুলি করে হত্যা করেছে, এই অভিযোগে এপিডিআর ডোমকল শাখার সহ-সভাপতি আব্দুল গনি ও সম্পাদক মাসুম রহমান কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল চক্রবর্তী'কে সঙ্গে নিয়ে ৭ জুন, ২০২২ তথ্যানুসন্ধানে যান।

সাগরপাড়ার মানুষের সহযোগিতায় তথ্যানুসন্ধান টিমটি রুহুল মন্ডল'র ঘরে পৌঁছায়। পচাত্তর বছর বয়সী সাহারুদ্দিন মন্ডল'র পঞ্চম সন্তান হল রুহুল মন্ডল। স্ত্রী, দিলরুবা বিবি। ১ মাস ১২ দিন হল রুহুলের সাথে বিয়ে হয়েছে। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। রুহুলের মা, আনেরা বিবি (৬২)। দাদা, মইজুদ্দিন মন্ডল (৪৯)। ভাবী, অশীলা বিবি। বোন, সুফিয়া বিবি। প্রত্যেকেই জানান, গত ৫ জুন, ২০২২ রুহুল ভোর পাঁচটা সারে পাঁচটা নাগাদ বর্ডার সংলগ্ন ১০/১২ বিঘা পাট লাগানো জমিতে বাঁশ দিতে গিয়েছিল। সঙ্গে পাশের সাঁওতাল গ্রামের চারজন লেবার ছিল। হঠাৎ করে ওই লেবারদের একজন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, রুহুলকে BSF গুলি করেছে। ঘরের প্রত্যেকেই জমির দিকে ছোটে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর BSF আটকে দেয়। দুর থেকে রুহুলের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

রুহুলের বড় দাদা মইজুদ্দিন মন্ডল বলেন, পুলিশ BSF'র বিরুদ্ধে তার করা অভিযোগ পত্রটি নিয়েও কোন কেস করে না। পরিবারের অভিযোগ ও দাবী :

১. রুহুলকে গুলি করে মারার পর পাচারকারী সাজানো হয়েছে।

২. রুহুলের সাথে যে চারজন লেবার গিয়েছিল, তারা সব!দেখেছে। তাদেরকেও BSF গুলি করে দেবে, এই ভেবে পালিয়ে গিয়েছে।

৩. পরিবারটি রুহুলের হত্যাকারী BSF ক্যাডারের শাস্তি চায়।

৪. পরিবারটি রুহুল'র স্ত্রী দিলরুবার চাকরি ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামের অনেকেই বলেন, BSF এখন আর নাম এন্ট্রি করেনা। কিন্তু প্রতিদিন চাষ করতে যাওয়া কৃষকদের দিয়ে ক্যাম্প পরিষ্কার করানো হয়। না' করতে চাইলে প্রচন্ড মারধোর করে, জমিতে চাষ করতে দেয়না, নানা রকম হেনস্থা করে।

তারা বলেন, রুহুল কোনদিনই পাচারকারি ছিলনা। একজন কৃষক ছিল। মাঝে মাঝে ভিন রাজ্যেকাজ করতে যেত। তারা আরও বলেন, পাঁচ ছয় বছর আগে একই গ্রামের রাজা ডাক্তার (পিতা: সিদ্দিকি ডাক্তার) নামে ১৮ বছর বয়েসের

এক যুবক সীমান্তবর্তী জমিতে চাষ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। উনাদের আশঙ্কা, BSF রাজাকে মেরে লাশ গায়েব করে দিয়েছে। তাদের অভিযোগ:

১. পুলিশ BSF'র অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেয়না। কোন কেস করেনা। কোন FIR করেনা।

২. রাত ৮ টার পর ঘরের বাইরে বেরোলেই বিএসএফ মারধর করে। পাচারকারী হিসাবে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। গোটা গ্রামে অঘোষিত জরুরী ব্যবস্থা জারি হয়ে যায়।

৩. তারা আক্ষেপ করেন, বিএসএফ'র দ্বারা অত্যাচারিত হয়েই হয়তো পুরুষানুক্রমে সারা জীবন তাদের বাঁচতে হবে। তাদের অভিযোগ, একাধারে ফসলের দাম নাই অপরধারে বিএসএফের অত্যাচার, তাদের ক্রমশ মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে। গতবছর পাট বোনার ব্যাপারেও বিএসএফ বাধা দিয়েছিল। কেন্দ্র-রাজ্য কোন সরকারই বর্ডার এলাকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণের কথা ভাবেনা। নিজভূমে নিজেদের বড্ড পরবাসী মনে হয়।

৪. তাদের আশঙ্কা, এরপর আবার BSF'র টহলদারি এলাকা ৫০ কিমি পর্যন্ত বাড়ালে এলাকার মানুষের জীবন নরকে পরিণত হবে। জীবন জীবিকার উপর এক ভয়াবহ আঘাত নামবে।

এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান মেম্বার কালাম মন্ডল'র সাথে দেখা হয়। উনি BSF'র অত্যাচার বা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কোন কথা বলতে রাজি হননা।

এরপর এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান টিম যারা গুলি চালিয়েছিল অর্থাৎ বিএসএফ'র ১৪৭ নাম্বার ব্যাটেলিয়ান সিংপাড়া ক্যাম্পে কথা বলতে যায়। কৈলাশ চান্দ, ASI ক্যাম্পের ইনচার্জকে কথা বলার জন্য ডাকতে যান। ফিরে এসে ইনচার্জের ক্যাম্পে না থাকার কথা জানান। আরও জানান, রুহুলের হত্যার বিষয়ে কথা বলতে গেলে প্রায় ৫০-৬০ কিমি দুরে লালবাগ BSF ক্যাম্পে দেখা করতে হবে। যেটা ছিল প্রায় অসম্ভব। আসলে তথ্য জানার প্রশ্নে BSF'র কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবেনা, এটা তথ্যানুসন্ধান টিম বুঝে গিয়েছিল।

প্রায় ১০ বিঘা জমি জুড়ে সিংপাড়া ক্যাম্প। একদম গ্রামের ভেতরে। ক্যাম্পের একদম পাশেই এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাচ্চারা স্কুল যায় ঐসব উর্দিধারী, বড় বড় বন্ধুক ধারী BSF ক্যাডারের সামনে দিয়েই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক অভিভাবকই এই অবস্থার বিরোধীতা করেন। তাদের দাবিঃ

১. অবিলম্বে BSF ক্যাম্প গ্রামের বাইরে বর্ডারের নির্দিষ্ট এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২. শিশু ও মহিলা সহ সমস্ত গ্রামবাসিদের ভয়মুক্ত পরিবেশে বিকাশ হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এপিডিআর টিম এরপর সাগরপাড়ার সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় সাগরপাড়া থানার আইসি'র সাথে দেখা করে। আইসি বলেন,

১. রুহুলের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়ছিল। এখনো রিপোর্ট আসেনি।

২. রুহুলের হত্যার কেস কেন হয়নি, জিজ্ঞেস করা হলে উনি জানান, রুহুলের দাদা একটি অভিযোগ জমা করেছে, 'সাহেব বললে FIR হবে'।

3. গ্রামবাসিদের অভিযোগ মত BSF'র অত্যাচার বা হত্যার কোন কেস হয়নি কেন জিজ্ঞাসা করা হলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়না।

যদিও বিকালবেলা সাগর পাড়ার ওসি ফোনে জানান মৃত রুহুল মন্ডল'র দাদা মইজুদ্দিন মন্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে বিএসএফ'র ১৪৭ নাম্বার ব্যাটেলিয়ান সিংপাড়া ক্যাম্পের বিরুদ্ধে FIR করা হয়েছে।

এপিডিআর তথ্যানুসন্ধান টিম এরপর সাগরপাড়ার রামনারায়ন পাড়া গ্রামে একটি প্রেস কনফারেন্স করে।

তথ্যানুসন্ধান থেকে এপিডিআর ডোমকল শাখা দাবি করে:

১. রুহুল মন্ডল হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে ও দোষী বিএসএফ ক্যাডারকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

২. কোর্ট কেসের জন্য প্রয়োজনীয় উকিল দেওয়া ও কোর্টের যাবতীয় খরচ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। রাজ্যের নাগরিকের দায়িত্ব রাজ্যসরকার এড়িয়ে যেতে পারেনা।

৩. রুহুল মন্ডলের স্ত্রী দিলরুবা বিবি'কে অবিলম্বে একটি সম্মানজনক চাকরি রাজ্যসরকারকে দিতে হবে।

৪. পরিবারের ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৫. সাধারণ মানুষের বসবাসকারী গ্রাম ও প্রাথমিক স্কুলের পাশ থেকে বিএসএফ ক্যাম্প সরিয়ে একদম বর্ডার লাইনে নিয়ে যেতে হবে। শিশু, মহিলা সহ সমস্ত গ্রামবাসির ভয়মুক্ত পরিবেশে বিকাশ হওয়ার ও বাঁচার অধিকার কিছুতেই কেড়ে নেওয়া চলবেনা।

৬. সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণ অর্থাৎ চাষ, চলাফেরা, গল্প করা, এক জায়গায় জড়ো হওয়া বা মত প্রকাশ করা - এই জাতীয় কোন বিষয়ের ওপরই বিএসএফ'র হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

৭. নিজভূমে পরবাসীর মত থাকতে হবে কেন? কেন বিএসএফ গ্রামবাসীদের প্রতি দখলদার বাহিনীর মত আচরণ করবে? মানুষের চাষবাস, রোজগার সবই কি বিএসএফের মর্জি মাফিক হবে? গ্রামের মানুষের এসব প্রশ্নের উত্তর মীমাংসা করে স্বাভাবিক জনজীবন ফিরিয়ে দিতে হবে।

৮. অবিলম্বে BSF'র টহলদারি এলাকা ৫০ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। গ্রামগুলি ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট বর্ডার এলাকায় BSF'কে ফিরে যেতে হবে।

৯. রাজ্য সরকারকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে সীমান্ত সেনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ কমিয়ে আনতে হবে।

আব্দুল গনি (সহ-সভাপতি) মাসুম রহমান (সম্পাদক)
ডোমকল শাখা
এপিডিআর

২) বারুইপুর জেল হেফাজতে মৃত চার যুবকের ব্যাপারে তথ্যসন্ধান:

এপিডিআর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৪ টি

থানা এলাকায় তথ্যাসন্ধান করা হয়।

সম্প্রতি বারুইপুর জেলে নৃশংস অত্যাচার করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চার বিচারাধীন বন্দিকে পিটিয়ে মারার ঘটনাকে বারুইপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট এর ফেসবুক পেজ থেকে (কথার জাগলারিতে) 'ফেক নিউজ' বলে প্রচার করে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা কমিটির উদ্যোগে তথ্যানুসন্ধান ও অবশেষে আন্দোলনের চাপে সমস্ত ঘটনার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল প্রশাসন। বাধ্য হল তড়িঘড়ি করে মৃতদের পরিবারদের ডেকে পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে। তবে আন্দোলন এখানেই থামছে না। যতদিন না এই চার বন্দিমৃত্যুর ঘটনার উপযুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে এবং দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।

গোটা ঘটনাটি নীচে দেওয়া হল।

গত জুলাই মাসের শেষ দিকে এক সপ্তাহের মধ্যে বারুইপুর জেল হেফাজতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চার বন্দীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার কথা একটা পোর্টাল নিউজ সূত্রে সামনে আসে।

জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কয়েক দফায় তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়।

মৃতেরা হলেন - আব্দুর রাজ্জাক দেওয়ান (৩৪), জিয়াউল লস্কর (৩৬), আকবর খান (৪০) এবং সাইদুল মুন্সী (৩৪)। সংবাদমাধ্যম সূত্রে দেখা গেছে, মৃতদের প্রত্যেকের সারা গায়ে বীভৎস মার-কালশিটের দাগ।

আব্দুর রাজ্জাক দেওয়ান, বয়স- ৩৪, গ্রাম -কুড়ালি। তিনি পেশায় মুরগি ব্যবসায়ী। ব্যাবসার কাজে বিহারে থাকতেন। গত ঈদউজ্জোহা উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে ফিরেছিলেন। গত ২৪/৭/২২ তারিখ, রবিবার সন্ধেবেলায় চার পাঁচজন সাদা পোশাকের (বারুইপুর থানার) পুলিশ এসে তাকে হঠাৎ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। আব্দুরের পরিবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় রেখে 'ওপর থেকে চাপ আছে' বলে ওরা তাকে নিয়ে চলে যায়। পরের দিন তাকে বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে, জানা যায় তার বিরুদ্ধে আইপিসি ৩৯৯, ৪০২ ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। বিচারে তার ১৪ দিনের জেল কাস্টডি হয়। বুধবার (২৭/৭/২২) আব্দুরের স্ত্রী বারুইপুর জেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে, তিনি জানান যে তিনি সুস্থ আছেন। এরপর শনিবার (৩০/৭/২২) দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে ঘুঁটিয়ারি ফাঁড়ির পুলিশ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে জানায় যে আব্দুর অসুস্থ, তাকে বারুইপুর হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে তারা হসপিটালে গেলে দেখে যে সে মারা গেছে। মৃতদেহের গায়ে অজস্র কালশিটের দাগ। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হসপিটাল থেকে বলা হয়, শুক্রবার (৩১/৭/২২) রাতেই তিনি মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ পুলিশকে জিজ্ঞেস করলে, দুর্ব্যবহার করে তাদের বের করে দেওয়া হয়।

জিয়াউল লস্কর, বয়স ৩৬, গ্রাম - ঘুঁটিয়ারি (সুভাষপল্লী), পেশায় অটোচালক। বারুইপুর-ক্যানিং রুটে তিনি বহুদিন ভাড়ার অটো চালাতেন। গত ২৫/৭/২২ তারিখে বারুইপুর রাসমাঠের কাছে 'বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি' বলে বিকেল সাড়ে চারটের দিকে বাড়ি থেকে বেরোন। অনেক রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরছিলেন না দেখে তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে বারবার ফোন করে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোনে তাঁকে ঐদিন পাওয়া যায়নি। পরদিন জিয়াউলের স্ত্রী থানায় গেলে জানতে পারেন, গতকাল (২৫/৭/২২) রাতে জিয়াউল সহ তার দুই বন্ধুকে বন্ধুর বাড়ি থেকে বেধড়ক মারতে মারতে তুলে নিয়ে গেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ২৬/৭/২২ বারুইপুর কোর্টে আনা হলে দেখা যায় তিনি খোঁড়াচ্ছিলেন। সন্দেহজনক ডাকাতির মামলা দেওয়া হয় তাদের। বিচারে ২৮ দিন জেল কাস্টডি হলে তাদের ঐদিন বারুইপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার (২৭/৭/২২) জিয়াউলের স্ত্রী বারুইপুর জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি জানান যে তিনি সুস্থ আছেন, ভীষণ কান্নাকাটি করেন। এরপর ২৮/৭/২২ তারিখে জিয়াউল জেল থেকে গোপনে ফোন করে স্ত্রীকে ফোন পে এর মাধ্যমে তিন হাজার টাকা পাঠাতে বলে। তিনি বলেন, এই টাকা দিলে জেলে ভালো ভাবে থাকা যাবে, ভালো খাবার খাওয়া যাবে। তাঁর স্ত্রী সেদিনই দু'দফায় তাকে দু'হাজার টাকা পাঠান। তারপর থেকে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ আর হয়নি। ২/৮/২২, মঙ্গলবার ঘুঁটিয়ারি ফাঁড়ির পুলিশ এসে জানায়, গতপরশু জিয়াউল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে সে গতকাল রাতে মারা যায়। অথচ, জিয়াউলের এই অসুস্থতার কোনো খবরই পরিবারকে আগে জানানো হয়নি। পরিবারের লোকজন এরপর বারুইপুর হসপিটালে গিয়ে মৃতদেহ দেখতে চাইলে প্রথমে দেখতে দেবে না বলে নানান টালবাহানা করে। পরে দেখতে দিলে দেখা যায়, জিয়াউলের গায়েও অজস্র মারের কালশিটের দাগ। জিয়াউলের সঙ্গে একই মামলায় গ্রেফতার অন্য দু'জনের তিন দিন আগে জামিন হয়েছে। তাদের সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (২৭/৭/২২) রাতে জিয়াউল অসুস্থ হয়ে পড়লে বৃহস্পতিবার তাকে জেল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দু'দিন ধরে তার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। বেডের সঙ্গে হাত পা বেঁধে প্রচণ্ড মেরে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হয়। বারুইপুর থানায় বর্তমানে হাজিরা দিতে গেলে এই দুজনকে থানা থেকে নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জিয়াউলের পরিবার জিয়াউলকে জেলে পিটিয়ে মারা হয়েছে এই অভিযোগে কোর্টে মামলা দায়ের করেছে। যেখানে কোর্ট থেকে অর্ডার দেওয়া হয় পোস্টমর্টেম এর সময় তার পরিবারের দুজন সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকতে পারবে। এবং গোটাটার ভিডিও রেকর্ডের দায়িত্বে থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও পরিবার সূত্রের দাবি,

এসব কিছুই করা হয়নি।

সাইদুল মুন্সী, বয়স ৩৪, গ্রাম -সন্তোষপুর। গত ২৫/৭/২২ তারিখে রাত বারোটায় মহেশতলা থানার পুলিশ সাইদুলের বাড়িতে এসে বলে, তাকে বড় বাবু থানায় দেখা করতে বলেছে। সাইদুলের স্ত্রী কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জানায় যে, এমনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি সঙ্গে যেতে চাইলে তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। পরদিন তার স্ত্রী কোন থানায় নিয়ে গেছে বুঝতে না পেরে প্রথমে জিঞ্জিরা বাজার পুলিশ ফাঁড়িতে খোঁজ করে, পরে মহেশতলা থানায় গিয়ে খোঁজ করে। প্রথমে কিছুতেই সাইদুলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পুলিশ ২০০ টাকা ঘুষ নিয়ে তাকে দেখতে দেয়। তার স্ত্রী দেখে সারারাত সাইদুলকে প্রচন্ড মারধর করা হয়েছে। এরপর তার স্ত্রী 'কেন মারছেন আপনারা ,কি করেছে ও?' একথা জিজ্ঞাসা করলে পুলিশ বলে ওর কাছে একটা ভোজালি পাওয়া গেছে। অথচ পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে শুধু সাইদুলকে ধরেছে পুলিশ , কোন অস্ত্র নিয়ে যায় নি সে। তারপর ওর স্ত্রীর সামনেই ওকে লাথি মারতে মারতে গাড়িতে তুলে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়, তার পর বারুইপুর জেলে পাঠায়। পরদিন জেলে গিয়ে ওর স্ত্রী দেখা করে। থানা থেকে স্বতোপ্রনোদিত ভাবে এক উকিল দায়িত্ব নিয়েছিল। পরে ওর স্ত্রীও একজন উকিল ঠিক করে। একটু দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য কারো সাথেই দেখা হয়নি তার। তবে উকিল জানায়, যে কেস দেওয়া হয়েছে তাতে ২৮ দিনের আগে জামিন পাওয়া সম্ভব নয়। নেক্সট কোর্ট ডেট ছিল ৮/৮/২২। তবে তার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১/৮/২২ তারিখে সাইদুলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অথচ সেদিন পরিবারের লোকজনকে এবিষয়ে কোনো খবর দেওয়া হয়নি। ২/৮/২২ মঙ্গলবার পরিবারকে জানানো হলে পরিবার বারুইপুর হাসপাতালে গিয়ে দেখে, বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালের বাথরুমে উলঙ্গ অবস্থায় মূত্রের উপর ফেলে রাখা হয়েছে সাইদুলকে। তার সারা পিঠে মারের দাগ। চিকিৎসার জন্য তারা বারবার অনুরোধ করলেও কোনো ফল মেলেনি। অবস্থা গুরুতর হলে ডাক্তার আইসিইউতে ভর্তি করতে বলেন, যদিও বারুইপুর হাসপাতালে আইসিইউ খালি ছিল না। পরিবার বেসরকারি হসপিটালে চিকিৎসার কথা বললে, পুলিশ তা খারিজ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়।

আকবর খান - বয়স ৪০। গ্রাম - আমতলা (থানা- বিষ্ণুপুর)। পরিবার সূত্রে দাবি, গত দশ বারোদিন ধরে আকবর খান নিরুদ্দেশ ছিল। পুলিশ যে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, সে ব্যাপারে পরিবারের কাউকেই কোনো খবর দেওয়া হয়নি। গত ২/৮/২২, মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ বাড়িতে খবর দেয় যে, সে মারা গেছে। পরিবারের অভিযোগ, সারা শরীরে মারের দাগ। পরিবারের আরো অভিযোগ, মৃতদেহ আনতে গেলে পুলিশ জানায় টাকা দিলে তবেই মৃতদেহ পরিবারকে দেওয়া হবে।

এই চারটি বন্দীমৃত্যুর ঘটনাতেই কমন বিষয়গুলি হল -

১)এই চারটি মৃত্যু ঘটেছে ৩১/৭/২২ থেকে ২/৮/২২ এর মধ্যে।

২)মৃত বন্দীদের আলাদা আলাদা থানার পুলিশ তুলে নিয়ে গেলেও তাদের সবাইকেই সন্দেহজনক ডাকাতির মামলা দেওয়া হয়।

৩) বারুইপুর জেলে বুধবার (২৭/৭/২২) পরিবারের লোকজন দেখা করতে গেলে মৃত বন্দীরা সকলেই জানান, তারা সুস্থ আছেন।

৪) এরপর এরা অসুস্থ হয়ে পড়লেও বাড়ির লোকজনকে সেইদিন কোনো খবর দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর একদিন বা দু'দিন পরে গিয়ে পুলিশ বাড়িতে খবর দেয়।

৫) চারজনের মৃতদেহেই বীভৎস মার-কালশিটের দাগ।

৬) চারজনই কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

অবিলম্বে এই গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি, মাদক সেবনের অজুহাতে জেল হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাকে লঘু করার প্রচেষ্টা বন্ধ, জেলগুলিতে বন্দিদের উপর লাগাতার চলা জেল কর্মী ও জেল পুলিশের অত্যাচার এবং লকআপে পুলিশি জুলুম তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ , মৃতদের পরিবারকে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং জেল ও পুলিশ লকআপে বন্দীদের মানবাধিকার হরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। আগামীকাল আইজি কারাকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

এপিডিআর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

৩) উন্নয়নের নাম করে নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদন

তারকেশ্বর-চকদীঘি

বাড়ির মায়েদের কাছে শুনেছি, 'একটি গাছ দশটি পুত্র সন্তানের সমান'। পৃথিবী জুড়ে এমন কত সন্তানকে আমরা হত্যা করে চলেছি, সে হিসেব আর কে রাখে ! দিনে দিনে কত নি-দয়া হয়েছি আমরা ! শধু কী নি-দয়া ! উদাসীনও হয়েছি আমরা সমানভাবে। উদাসীন আমরা প্রাপ্তবয়স্করা। নইলে, হুগলী জেলার তারকেশ্বর-চকদীঘির রাস্তার পাশের বৃক্ষনিধন রুখতে সন্তানকে বাঁচাতে মায়ের মত বুকে জড়িয়ে আগলে রাখবে কেন স্কুলপড়ুয়া বালক বালিকারা !

হুগলী জেলার তারকেশ্বর ষ্টেশনের কাছ থেকে বর্দ্ধমান জেলার মেমারি'র চকদীঘি পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তারকেশ্বর- চকদীঘি সড়ক নামে পরিচিত। এটি একটি জেলা সড়ক। এই রাস্তার দু'পাশের বিস্তীর্ণ ভূমি অত্যন্ত উর্বর। দামোদর নদের বিভিন্ন প্রবাহের জলে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের জমি। ফলতঃ কৃষি সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। ধান

এবং আলু প্রধান ফসল। আলু উৎপাদন এবং আলুর বাণিজ্য এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সড়কগুলি সাধারণভাবে যেমন প্রশস্ত হয় তারকেশ্বর- চকদীঘি সড়কও তেমন চেহারায় ছিল। এই গ্রামীন জেলা সড়কের ত্রিশ কিলোমিটার জুড়েই দু"পাশেই বিভিন্ন প্রজাতির সারিবদ্ধ বৃক্ষের সমারোহ ছিল। এমন কী রাস্তার দু'পাশের সংলগ্ন বাড়িগুলির সীমানা এবং উঠোনে নিম, বট সহ বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালা রয়েছে।

২০১৮ সালে এই রাস্তাকে প্রস্থে বাড়াতে হবে বলে সিদ্ধান্ত করে সরকার । ৩৮ ফুট চওড়া রাস্তা হবে। হয়তো এ-পথে কোন এক বিদেশি দৈত্য'র আগমন ঘটবে। তার যুগল চরণের চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাবে আমার দেশের কৃষকের বুকে। সেই বিদেশি দৈত্যের সর্বগ্রাসী খুদা কেড়ে খাবে আমাদের দেশের মানুষের মুখের গ্রাস। খবর শুনে, ভবিষ্যৎ আন্দাজ করে তারকেশ্বরের-নালিকূল অঞ্চলের লিটল ম্যাগাজিন গ্রুপ সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেয়। তাঁদের আশাঙ্কা ছিল, ত্রিশ কিলোমিটার জুড়ে রাস্তার দু"পাশের সারি সারি গাছ-পালা কেটেই এই রাস্তা আটত্রিশ ফুট চওড়া হবে ! আশঙ্কা থেকেই প্রতিবাদী চিঠি পাঠিয়েছিল তারকেশ্বর-নালিকূল অঞ্চলের লিটল ম্যাগাজিন গ্রুপের কয়েকজন যুবক-যুবতি। ২০২১ পর্যন্ত এখানেই থেমে ছিল।

এ-বছর ২০২২ মে, মাঝামাঝি সময়ে নজরে আসে তারকেশ্বর চাউলপট্টি থেকে বাসুলি হয়ে দশঘড়া'র' দিকে পি ডব্লিউ কন্ট্রাকটর নির্বাচারে বৃক্ষ কেটে চলেছে। তারকেশ্বর লিটল্ ম্যাগাজিন গ্রুপ, গ্রিন মেটস স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং কিছু নবীন বয়সী সমবেত হ'ল। মে মাসের ১৮ তারিখ দশঘড়া মোড়ে পি ডব্লিউ ডি'র কন্ট্রাকটর নির্বিচারে গাছ কেটে চলেছে । সেই সময় দু'টি অর্দ্ধেক কাটা গাছের গোড়ায় বসে পড়লো সমবেত প্রতিবাদী'রা। বাদানুবাদ শুরু হল। হুমকি দিতে শুরু করলো কন্ট্রাকটরের লোকজন। জড়ো হল শাসকদলের নেতা কর্ম্মীরা। উন্নয়ন বিরোধী বলে পরিবেশ কর্ম্মীদের অকুস্থল থেকে চলে যেতে হুমকি দিতে শুরু করলো। কিছু মানুষও জড়ো হয়েছিল রাস্তা চওড়া হওয়ার পক্ষে। আবার সংখ্যায় কম হলেও কিছু মানুষ পরিবেশ কর্ম্মীদের পক্ষে কথা বলতে শুরু করে। এমতবস্থায়, অকুস্থলে ধনেখালি থানার পুলিশ এসে হাজির। প্রথমে রাষ্ট্র তার অনুগত পোষা শাসক দলের বাহিনী পাঠিয়ে পরিবেশ কর্ম্মিদের বিরত করতে চেয়েছিল । এবার এল উর্দ্দিধারী পুলিশ। আজকের পুলিশ আইন রক্ষার ব্যবস্থা করার চেয়ে তাকে কি করে ভাঙা যায় সে বিষয়ে ক্ষমতাশালীকে সাহায্য করার কাজে বেশি দক্ষ। পরিবেশের কোন আইন ভাঙা হয়েছে তার কাগজ দেখতে চাইলো পুলিশ। বিভিন্ন ধরণের হুমকিতেও পিছু হঠতে রাজী নয় পরিবেশ কর্ম্মীরা। গাছের গোড়া ঘিরে বসে আছে, গাছের সঙ্গে 'চিপকে' অর্থাৎ জড়িয়ে আছে যুবকরা। 'চিপকো' আন্দোলনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ওরা। কে পৃথক করবে আজ ওদের ! জীবন যে উদ্ভিদ সংলগ্ন। এক না-হলে অন্যে বাঁচবে না, তাদের জীবনের আতিক্রান্ত এতটুকু সময়েই উপলব্ধি করেছে তাঁরা।

পরিবেশ কর্ম্মীদের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তার সঙ্গে পেরে উঠলো না পুলিশ। শেষে, সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে পুলিশ গাড়িতে তুলে ধনেখালি থানায় নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে গিয়ে অকথ্য গালি-গালাজ শুরু করল যুবকদের উদ্দেশ্যে। এ-এক ধরন হয়েছে আজকের পুলিশের। শরীরে আঘাত করতে যখন পারে না, তার বহিঃপ্রকাশ করছে অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে উন্মত্ত পুলিশ। গালি-গালাজ যে আঘাতের চেয়েও বেশী মর্ম্ম বেদনার কারণ হয়, যতটুকু মর্যাদা আছে মানুষের তাকেও অস্বীকার করা হয়, এ-কথা কোন শাসক বোঝাবে পুলিশকে। রাতে থানা থেকে কেস দিয়ে পরিবেশ কর্ম্মীদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। ১৯ মে তারিখেও কন্ট্রাকটরদের গাছ কাটায় বাধা দেয় আরও বেশী পরিবেশ কর্ম্মী জমায়েত করে। পরিবেশ কর্ম্মীরা একটি কথা বার বার বলতে থাকে, মোট ৮২৬ টি গাছ কাটার অনুমতি । প্রায় ১১ কিলোমিটার পথের ধারের প্রায় ৫০০টি চিহ্নিত গাছ দেখা গেছে । এবং তাদের বেশীরভাগই কাটা হয়ে গেছে। বট, অশ্বত্থ, নিম শিরীষ প্রজাতির গাছ পর্যন্ত আছে। নির্বিচার নিধন চালিয়েছে। যে বিষয়টি আমাদের অবাক করেছে, রাস্তার নয়ানজুলী পার হয়ে এবং পি ডব্লু ডি কৃত সীমানার খুটি ছাড়িয়ে বৃক্ষ নিধন চলেছে। এমন কী বাড়ির উঠোনেও পৌছে গেছে গাছ চিহ্নিত করতে। বেশ কিছু বাড়ির উঠোনের গাছ থাকলেও ইতিমধ্যেই এর চেয়ে অনেক-অনেক বেশী গাছ কাটা হয়ে গেছে। হুগলী জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগর ও পরিবেশ দপ্তরের বর্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষের নজরে এসেছে , খবরে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এ পি ডি আর হুগলী জেলা কমিটি ২১ মে তারিখে তথ্যানুসন্ধানে যায়।

আমদের পর্যবেক্ষণ: ১) যে গাছগুলি কাটা হবে, সেগুলি মার্কিং করা হয়েছে। মার্কিং করা বেশ কিছু গাছ কাটাও হয়ে গেছে। এটা লক্ষ্য করা গেল, যে পূর্ত দফতরের চিহ্নিত এলাকার মধ্যে বেশ কিছু সাধারণ গাছ যেমন শিরিষ গাছ মার্কিং করা হয়নি । কিন্তু এটা বোঝা যায়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই সব অ-চিহ্নিত গাছও কেটে ফেলা হবে।

২) ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, হাওড়া-হুগলী, ০১-০৪-২০২২ তারিখের অর্ডারে তারেকেশ্বর-চকদীঘি রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ৮২৬ টি গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী গাছ কাটা হচ্ছে। তথ্যানুসন্ধানী দল দেখতে পেয়েছে, তারকেশ্বর ষ্টেশনের কাছ থেকে মাত্র ১০-১১ কিলোমিটার দূরের বাসুলি পর্যন্ত রাস্তাতেই মার্কিং করা ও মার্কিং না-করা এরকম কেটে ফেলা প্রায় ৫০০ টি গাছ দেখতে পেয়েছে।

৩) রাজ্য পূর্ত দফতর চিহ্নিত নিজস্ব এলাকা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত জমিতে অবস্থিত গাছও মার্কিং করা হয়েছে। বেশ

কিছু ক্ষত্রে কেটেও ফেলা হয়েছে।

৪) রাজ্য পূর্ত্ত দফতর চিহ্নিত এলাকার মধ্যে অথচ সম্ভাব্য সম্প্রসারিত রাস্তার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত পূরণো এবং বড় গাছগুলিকেও কেটে ফেলা হয়ছে।

৫) পরিবেশ রক্ষা কর্ম্মীরা সাধারণ মানুষের সাহায্যে গাছ বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাদের থানায় ডেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের 'উন্নয়ণ বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

(APDR , হুগলি জেলা কমিটি)

সংগঠন সংবাদ :

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি (এপ্রিল - সেপ্টেম্বর) :
গত ২৬-২৭ মার্চ ২০২২, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে হয়ে গেল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, সদস্যরা পেল তাদের বহু প্রতিক্ষীত কার্যকরী কমিটি যা করোনা কাল থেকে চলতে থাকা সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিবন্ধকতাকে ভাঙতে সাহায্য করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে যা সহায়ক হবে। সমিতির অভ্যন্তরে কিছু সদস্যদের সৃষ্ট বিতর্ক ও সম্মেলন আয়োজনে বাধা দান সত্ত্বেও শেষ অবধি সদস্যদের ঐকান্তিক চেষ্টায় অবসান হলো সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের বিপুল সমর্থনে গৃহীত হলো বিদায়ী সাধারণ সম্পাদকের পেশ করা কার্যকরী কমিটির প্যানেল।

উপস্থিত সদস্যরা বর্তমান কমিটির সদস্যদের ওপর আস্থা জানিয়ে আগামী দু বছরের জন্য সমিতিকে পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন রঞ্জিত সূরের নেতৃত্বে কর্মসমিতিকে এগিয়ে চলতে। সদস্যদের একাংশ তাদের ই 'সহমতের' ধারণাকে নস্যাৎ করে একটা অন্য প্যানেল দিলে, তা উপস্থিত সদস্যরা তাতে সহমত না হলে তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা ছাপার অক্ষরে ও হাতে লেখা পদত্যাগ পত্র সভায় পেশ করে ও সমিতির নামে 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করে।

সদস্যদের আকাঙ্খা কে মান্যতা দিয়ে নতুন কর্ম সমিতি কে দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয় এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে।

এরপর শুরু হয় কর্ম সমিতির কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সফল ভাবে রূপায়ণ করবার নিরলস চেষ্টা। ২রা এপ্রিল ২২ মৌলালী থেকে ধর্মতলা মিছিলের ডাক দেওয়া হয়, মিথ্যা মামলায় সমাজ কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। এদিন সদস্যদের উৎসাহে তা সফল ভাবে রূপায়িত হয়। ১৮ এপ্রিল ২২ সারা রাজ্যে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার এর সার্বিক অবনতির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রীট থেকে ধর্মতলা মিছিলের আয়োজন করে কর্মসমিতি।

২মে ধর্মতলায় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে শিয়ালদহের কোলে মার্কেটের সামনে পথসভায় মিলিত হয় উৎসাহী সদস্যরা।

মাওবাদী জিগির তুলে গণ আন্দোলনের কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ও তাদের মুক্তির দাবিতে এই সভা।

৬ মে ২২ সরকারী মদতে দেশজুড়ে সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে সভা হয় কলেজ স্ট্রিট মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এর সামনে।

২৩ মে পূর্ব কোলকাতার শাখা অফিসে আয়োজন করা হয় অপর একটি সাংবাদিক সম্মেলন।

২৪ মে ২২ মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এর সামনে থেকে ধর্মতলা মিছিল হয় রাজ্যে নিস্ক্রিয় মানবাধিকার কমিশন কে সক্রিয় করবার দাবিতে।

২৮মে মদনপুরে এলাকার নাগরিকদের ভয় দেখিয়েএনআইএর পক্ষে অনৈতিক ভাবে কাজ করবার ফরমানের বিরুদ্ধে একটি মিছিল ও প্রতিবাদী পথসভার আয়োজন করে এই কর্মসমিতি।

১ জুন ২২ নাগরিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকার ও বিরোধীদল দায়িত্বহীন ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যেভাবে সক্রিয় হতে দিচ্ছে না ও তা চালু করবার দাবিতে হাজরা মোড়ে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়।

৯ জুন ২২ মুর্শিদাবাদে সাগরদীঘিতে বিএসএফ এর গুলি চালনা ও টহলদারি এলাকা বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত করবার প্রতিবাদে শ্যামবাজার টাইটান শোরুম এর সামনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। সভায় এসএসসির নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরত প্রার্থীদের পক্ষে তাদের কর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৪ ও ২৫ জুন ২২' দুটি অনুষ্ঠান পালন করা করা হয়। ২৪ শে জুন সমিতির কার্যালয় থেকে ট্যাবলো সহযোগে শোভাযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন স্থানে প্রচার সভা করা হয় যা যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ড এ শেষ হয়। ২৫ শে জুন ২২ কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে সারাদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের বক্তব্য, গান, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশনা দিয়ে পালন করা হয় সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতিতে। এছাড়া প্রদর্শিত হয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল কান্ডারীদের বক্তব্যের ভিডিও শো ও সমিতির অতীতের দলিলের কিছু চিত্র প্রদর্শনী।

২৭ শে জুন ২২ তিস্তা শেতলবাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হাজরা মোড়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি পথসভা। ৪ জুলাই ২২ কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা মিছিলে মুর্শিদাবাদে আদানির স্বার্থে, অধিকার

রক্ষার জন্য সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের ওপর রাজ্য প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই মিছিলে অন্যান্য কিছু সংগঠনের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ৫ জুলাই ২২ ফাদার স্ট্যান স্বামীকে হত্যার একবছর পূর্ণ হওয়ায় সিডিআরও র কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সামনে তাঁর স্মরণ সভা আয়োজন করে। আরও চারটি শাখা এই স্মরণ সভার আয়োজন করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি, কৃষ্ণনগর শাখা, চুঁচড়া শাখা ও বালী শাখা। ১১ জুলাই ২২ কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মানুষ মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ এর দাবিতে কলকাতা কর্পোরেশন অফিসে মিছিল করে ডেপুটেশন দেওয়ার আয়োজন করে কর্মসমিতি। ১৮ জুলাই ২২ বনাঞ্চল প্রকৃতি ধ্বংস করে জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে পথসভা হয় হাজরা মোড়ে। ১০ আগস্ট ২২ দেউচা পচামিতে কয়লা খনির বিরুদ্ধে নাগরিক সমন্বয় মঞ্চের ডাকে মিছিলে যোগদান ও ঐ দিন বারুইপুরে থানায় ও জেল হেফাজতে চারজন সংখ্যালঘু যুবক হত্যার অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্যের কারা আইজি কে মিছিল করে ডেপুটেশন দেয় এক প্রতিনিধি দল। ১৬ আগস্ট ২২ UAPA, NIA, NSA বাতিলে ও সারাদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বৌবাজার ব্যাঙ্ক আফ ইন্ডিয়ার সামনে পথসভা করা হয়।

২৭শে আগস্ট ২২ মহাবোধি সোসাইটি তে পরিবেশ অধিকার আন্দোলনের কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সদস্যরা ও সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সমিতির সহ সভাপতি তাপস চক্রবর্তী।

৯ সেপ্টেম্বর ২২ ভারত সভা হলে সমিতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতের বিচার ব্যবস্থা কোন পথে শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী, সাংবাদিক ও অধ্যাপক ও শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ। আলোচকরা এই সময়োপযোগী আলোচনা সভা আয়োজন করবার জন্য সমিতিকে প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াও আমন্ত্রিত বহু মানুষের উপস্থিততে সভা সফল ভাবে সম্পন্ন হয়।

হুগলি জেলা :

২১/০৬/২২ চুঁচুড়া মাঝের রাস্তা সাঁকো মোড়ের তরুণময় মোদকের শব্দদূষণের প্রতিবাদ করায় হেনস্তার চুঁচুড়া শাখার তথ্যানুসন্ধান

২২/০৬/২২ ত্রিবেনী- বাঁশবেড়িয়া শাখার পথসভা (ত্রিবেণী বাস স্ট্যান্ড/ বাঁশবেড়িয়া বেলতলা)

২৬/০৬/২২ ক্রিমিনাল আইডেন্টিফিকেশন (প্রসিডিওর) অ্যাক্ট, ২০২২ বিষয়ে চুঁচুড়া শাখার আলোচনা সভা (উপস্থিতি- ৪৭)

২৯/০৬/২২ তিস্তা শেতলাওয়াড ও মহম্মদ জুবেইরের অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শেওরাফুলিতে জেলা কমিটির দুটি পথসভা ও মিছিল

০৫/০৭/২২ হেপাজতে স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে জেলা কমিটির পথসভা২৩/০৭/২২ ডি এফ ও, হাওড়ার সাথে সাক্ষাৎ করে এন এইচ ১৯ ও তারকেশ্বর-চকদিঘী রোডের দুপাশে নির্বিচার গাছ কাটার বিষয়ে এবং আর টি আই সম্পর্কিত আলোচনা। ৩১/০৭/২২ "হুগলী জেলায় এ পি ডি আর- ৫০ বছর স্মৃতির আয়নায়" ডেনিস গভর্নর হাউজে হুগলী জেলা কমিটির সভা (উপস্থিতি- ৭০) ১০/০৯/২২ যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতার শ্রীরামপুর শাখার তিনটি প্রচার পথসভা (শ্রীরামপুর টিকিট কাউন্টার/স্টেট ব্যাংক/সম্রাট রেস্তোরাঁ।

২৬/০৯/২১ শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত 'যতীন লাহিড়ী স্মারক বক্তৃতা' (বক্তা- কণিষ্ক চৌধুরী/ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বিষয়- লক্ষ্য হিন্দু রাষ্ট্র: ইতিহাসের বিকৃতি) উপস্থিতি- ৫৫

বিবাদি বাগ শাখা

গত ২৫ শে জুলাই এপিডিআর, বিবাদি বাগ শাখার উদ্যোগে বিবাদি বাগ এলাকায় প্যানডেমিক ট্রিটি ও প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্য বিল নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন জনস্বাস্থ্য মোর্চার ডাঃ ভাস্কর চক্রবর্তী এবং 'গ্রাফ' সংগঠনের ডাঃ গৌতম দাস। সভা পরিচালনা করেন রোগীর অধিকার আন্দোলনের সুপরিচিত কর্মী এবং শাখা সদস্য উত্তান বন্দোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত জন স্বাস্থ্য বিলে কিভাবে জনস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন বক্তারা। বক্তাদের বক্তব্য শেষে বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। মূলত জানাবোঝার জন্যই ছিল এই আলোচনা সভাটি। আগামীদিনে স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আরও যৌথ কর্মসূচি নেওয়ার বিষয়েও সংগঠনগুলি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) পানিহাটী শাখাও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সমূহের যৌথ উদ্যোগে, ঘোলার মোড়, সোদপুরে ৫০ তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ই জুন, ২০২২) উৎযাপন

প্রকৃতি-পরিবেশ আজ বিপন্ন। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব ফলাতে গিয়ে মানুষ আজ পরিবেশকে ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে সে বহুদুর চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মদতে কর্পোরেট এবং স্বার্থান্বেষী মানুষের পাহাড় প্রমাণ মুনাফা

এবং সর্বগ্রাসী লোভ পৃথিবীতে আজ মানুষসহ সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে ভয়ংকর ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনুধাবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 'প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপর আসে বিনাশের পালা।' প্রকৃতির নিয়মসীমায় যে সহজ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য তত্ব আছে তাকে ক্রমাগত উপেক্ষা করলে পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষেরও ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। এর থেকে উত্তরণের একটাই পথ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য 'শুধু একটাই পৃথিবীকে' আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে।তাছাড়া খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ৪ক পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য (৫১ ক (জ)অনুচ্ছেদ],'অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, জলাশয়, বন্যপ্রাণীসহ, স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি বিধান করা এবং জীবজন্তুদের প্রতি মমত্ব পোষণ করা।'

অথচ সুস্থ পরিবেশের প্রতি সংবিধানের এই স্বীকৃতিকে রাষ্ট্রই মান্যতা দেয় না। জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মুনাফার জন্য বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ চলছে। কর্পোরেট, বহুজাতিক সংস্থা, ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারের বাড়বাড়ন্ত। সরকারের কঠোর আইন আছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ নেই। এর প্রতিকারে পঞ্চায়েত, পুরসভা, থানা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনো উদ্যোগ নেই। সবাই চোখ বুজে রয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরিবেশ কর্মীরা এবং মানবাধিকার কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে।

জলাশয় এবং জলাভূমি বুজিয়ে চলছে বেআইনী নগরায়ণ - আপনারা জানেন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক জলাভূমি ও জলাশয়ের অবদান অপরিসীম। জলাশয় বা জলাভূমি বোজানো চলতে থাকলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, পরিবেশে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যহত হয়। জলাশয় এবং জলাভূমি মাটির তলায় জলের আদান প্রদান ক'রে জলস্তরের মান বজায় রাখে। জলাভূমির বিভিন্ন উদ্ভিদ, শৈবাল ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুজীব দূষিত নোংরা জলে মেশা ভারী ধাতব যৌগ শোধন করে। তাই জলাভূমিকে বলা হয় 'প্রকৃতির বৃক্ক'। পুকুর, জলাশয় এবং জলাভূমি অতিবৃষ্টির সময়ে জলধারণ ক'রে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। জলাশয় এবং জলাভূমির পরিমাণ হ্রাস পেলে ভূগর্ভস্থ জলাধার রিচার্জড (জলের অনুপ্রবেশ হতে পারে না। ফলে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নেমে যায়। এ ছাড়াও অগ্নিকাণ্ডের মোকাবিলা নিবিড় মৎস্য চাষ, সমবায় উদ্যোগে মৎস্য চাষ ইত্যাদির ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে জলাশয় ও জলাভূমি অর্থনৈতিক গুরুত্বও বহন করে।

কিন্তু তবু সব আমলেই শাসক দলের মদতপুষ্ট প্রোমোটার শ্রেণী পুকুর ও জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনী বহুতল নির্মাণ করছে। পুরসভা বা সরকারের কোনো বৈজ্ঞানিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই বলে প্রতিদিনের সংগৃহীত সমস্ত ধরণের দূষিত বর্জ্য ও প্লাষ্টিক তারা নিজেরাই জলাভূমি ও জলাশয়ে ফেলছে। সরকারের নিজস্ব আইনকেই তারা মান্যতা দেয় না। পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্য দপ্তর (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৩ অনুসারে ৪ কাঠা বা তার চেয়ে বড় আয়তনের যে কোনো পুকুর, জলাভূমি নিষিদ্ধ ও বেআইনী। যে বা যারা ভরাট করবে তাদের বা তাদেরকে নিজ ব্যয়ে ভরাট পুকুরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে। আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি ২ বছরের কারাবাস এবং ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। ১৯৯৭ সালের সংশোধনে এটাকে জামিন অযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শহর এবং শহরতলী উন্নয়ন পরিকল্পনা আইন (T & CP) ১৯৯৭ এর ৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, 'জমির দৃশ্যগত চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না।' এছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিম্নলিখিত আইনগুলো অনুসারে পুকুর বা জলাভূমি ভরাট করা ফৌজদারি অপরাধ। কৃ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৩৩নং ধারা খূ পরিবেশ রক্ষা আইন ১৯৮৬ গূ জল সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন।

ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে - নরম পানীয় এবং বোতলবন্দী জলের সরবরাহ বজায় রাখতে, উচ্চ ফলনশীল হাইবিণ্ডড চাষের জন্য এবং দিকে দিকে ভৌম জলের বেআইনী বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে মাটির নীচের জলস্তর ভয়ংকরভাবে নেমে যাচ্ছে এবং এর ফলে বাড়ছে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ। ভারতে ট্রেনে করে জল পৌঁছায় তামিলনাড়ু। পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষ জল সংকটে ভুগছেন। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।

অত্যধিক পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে কার্বন নিঃসরণ এবং গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ু দূষণের কবলে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ। যানবাহনের কালো ধোঁয়া, আতসবাজির ধোঁয়া, শিল্প ক্ষেত্রের গাঢ় কালো ধোঁয়া বাতাসে মিশছে। কানপুর, দিল্লী, কোলকাতা সহ ভারতের ১৪টি শহর ভয়ংকর দূষণের কবলে। এখানে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাত্রা নিরাপদ স্তরের থেকে বহুগুণ বেশী। হাঁপানি, ঙ্ঘাঞ্জঞ্চঙ্গ, ক্যানসার রোগের প্রাদুর্ভাব আজ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে।

ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের জলতল। বসতি বিলীন হচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও গাছ কাটা হচ্ছে। যশোর রোডের দুই দিকে শতাব্দী প্রাচীন 'ছায়াসুনিবিড় বৃক্ষে×ণী' নির্মমভাবে কাটা হয়েছে শুধুমাত্র 'রাস্তা প্রসারিত করার' অছিলায়। মানুষের লোভের আগুনে জ্বলছে পৃথিবীর কুড়ি শতাংশ অক্সিজেন সরবরাহকারী জীববৈচিত্র্য ভরপুর বৃহত্তম বৃষ্টিবন আমাজন এবং আফিণ্ডকার বিভিন্ন দেশের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। আমাদের দেশেও ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গেও আদানি, আম্বানি, বেদান্তদেরকে প্রকৃতিকে লুঠ করার ঢালাও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বনবাসী, মূলবাসী এবং আদিম জনজাতিকে বাস্তুচুযত করার চক্রান্ত চলছে। মুনাফা ছাড়া বাস্তুতন্ত্র, জনস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের কোনোও মূল্যই এদের কাছে নেই। এছাড়াও চলছে শব্দদূষণ, নদী দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ ইত্যাদি।

বিপর্যস্ত নিকাশী ব্যবস্থা। যথেচ্ছ প্লাষ্টিকের ব্যবহার ও যত্রতত্র ফেলে দেওয়ার কারণে নালা-নর্দমা ও ম্যানহোল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত নিকাশী নালা / খাল নিয়মিত পরিষ্কার ও সংস্কারের অভাবে দিনের পর দিন জমা জল সরছে না এবং তার থেকে রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্লাষ্টিক-আবর্জনার ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামুদ্রিক বায়োস্ফিয়ার। দূষণের ফলে বিলুপ্ত হচ্ছে সামুদ্রিক জীব, নষ্ট হচ্ছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া, বাড়ছে ক্ষতিকর অণুজীবের

সংখ্যা।

পরিবেশ নিধনের এই রাজসূয় যজ্ঞের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি-পানিহাটী শাখা, সোদপুর বিজ্ঞান চেতনা, নিকাশী ব্যবস্থা প্রতিকার উদ্যোগ-পানিহাটী, আহ্বান, ফণ্ডাইডে ফর ফিউচার-পানিহাটী এবং ডা ভাস্কর রাও জনস্বাস্থ্য কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৫ই জুন, ২০২২ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন করা হয়। পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষার জন্য যে কোনো অশুভ উদ্যোগকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। সকাল ৯টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

ফণ্ডাইডে ফর ফিউচার-পানিহাটী সদস্যদের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অবস্থান কর্মসূচী শুরু হয়। এর পরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তারা পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে বক্তব্য রাখেন। এ পি ডি আর -পানিহাটী শাখার সভাপতি ও এ পি ডি আরের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রী ধীরাজ সেনগুপ্ত, এ পি ডি আরের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রঞ্জিত শূর, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাস্বপন বিশ্বাস, অধ্যাপক শুভাশীষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গুরুপ্রসাদ কর, দেবল চক্রবর্ত্তী, পরিবেশকর্মী সুনীল চক্রবর্ত্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী ও পরিবেশ কর্মী শ্রী তপন কুমার রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের তরুণ চিত্রশিল্পী সোহিনী চক্রবর্ত্তী এবং প্রবীণ চিত্রশিল্পী সৌমিত্র লাহিড়ী অনুষ্ঠান মঞ্চে বসেই ক্যানভাসে রং-তুলি দিয়ে পরিবেশ-ঘাতকদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যেবেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূলপর্বে 'আহ্বান' সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশুশিল্পীরা অসামান্য নৃত্য পরিবেশন ক'রে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেয়। পানিহাটী এ পি ডি আরের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সবশেষে 'জনগণমন' নাট্যদলের নাটক 'পোষ্টার' বিষয়, আঙ্গিক ও অসামান্য উপস্থাপনায় বিপুল দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সময়োপযোগী এই কর্মসূচী পরিবেশ রক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে তেমনই পরিবেশ রক্ষায় এ পি ডি আরের ধারাবাহিক লড়াইকে তাঁরা কুর্ণিশ জানিয়েছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি-পানিহাটী শাখার সর্বাত্মক উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনের ১৩ জন ছাত্রকে পৃথকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা (২০২২) নেওয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নিল।

আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন, উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটী বিধানসভায় অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক প্তুর্ণল। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে ২০২০-২০২১ সালে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিলো সেই সময় (২০২১ সালূে আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তন প্তুর্ণলের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকর্মীদের গাফিলতিতে ঐ স্কুলের ১৩ জন ছাত্রের নাম ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসেবে তাঁরা পর্ষদে পাঠায়নি। যদিও ঐ ১৩ জন পরীক্ষায় বসার প্রাকশর্ত হিসেবে যাবতীয় বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া (টেষ্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, রেজিঃ নং প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পন্ন করার পরেও তাঁরা মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে (০২/০৩/২২) ADMIT Card পায় নি। ফলে ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র তারা পায়নি। পর্ষদ থেকে জানানো হয় তাঁদের নামই নথিভুক্ত করা হয়নি।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এবং অঞ্চলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রবল বিক্ষোভের মুখে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরে এই ভুলের দায় ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেয়। আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমগুলোতে গুরুত্ব সহকারে এই সংবাদ সম্প্রচারিত হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্তব্যে সম্পূর্ণ অবহেলায় ১৩ জন কিশোর ছাত্রের ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে পড়ে যায়। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এ পি ডি আর-পানিহাটী শাখার তথ্যানুসন্ধানী টিম সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্রদের সঙ্গে ১০/০৩/২২ তারিখে যোগাযোগ করে তাদের দাবীর সপক্ষে সমস্ত তথ্য পর্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ছাত্রদের কোনো ত্রুটিই ছিল না। বিদ্যালয়ের উদাসীনতায় তারা পরীক্ষায় বসা থেকে বঞ্চিত হয়। শাখার পক্ষ থেকে গত ১৩ই মার্চ, ২০২২ ও ১৪ই মার্চ ২০২২ ঐ ১৩ জন ছাত্রের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের বয়ানে পঃবঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, পঃ পঃ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের কাছে ২০২২ সালেই তাদের জন্য পুনরায় মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি আবেদনে পৃথকভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। রাজনৈতিক চাপের কাছে পরে ২ জন শিক্ষার্থী আবেদন প্রত্যাহার করে। এর পরে শাখার পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কছে আলাদা আলাদা ভাবে ১৫ই মার্চ ২০২২ তারিখে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পানিহাটী শাখার পক্ষে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অলোক দাস, রমেন মালাকার ও তুফান চক্রবর্ত্তী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রী কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় আশ্বাস দেন যে তাঁরা ঐ ১৩ জন পরীক্ষার্থীর জন্য পৃথক মাধ্যমিক পরীক্ষার আয়োজন করবে। অবশেষে গত ৩০শে এপ্রিল, ২০২২ থেকে ৯ই মে, ২০২২ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ঐ ছাত্রদের জন্য পৃথক মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলও একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ঐ ১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জনই সফলভাবে কৃতকার্য হয়। পানিহাটীর সাধারণ মানুষ ও সমাজ মাধ্যমে AP-DR-এর এই আন্তরিক উদ্যোগ ভীষণভাবে অভিনন্দিত হয়।

তিনটি বড় বড় পুকুর বুজিয়ে এবং জমির বেআইনী রূপান্তরের মাধ্যমে আগরপাড়ার ডাকব্যাক কারখানার সন্নিহিত লাহাবাগানের শিশুদেরখেলার মাঠে অবৈধ নির্মাণ চলছে

পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্গত ১১ নং ওয়ার্ডের আগরপাড়ায় ডাকব্যাক কারখানার কাছে লাহাবাগান অবস্থিত। বি.এল.আর.ও. (ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দ®রেৃ রেকর্ড অনুসারে পার্বতীচরণ লাহার নামে ৪০ বিঘা (বাকী ৪ বিঘার রেকর্ডের হদিশ পাওয়া যায়নিূ জমি হলো এই লাহা বাগান। জমির দলিল এবং রেকর্ড অনুসারে কোনো উত্তরাধিকারীর নামের উল্লেখও নেই সুদীর্ঘকাল যাবৎ আগরপাড়া এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের শৈশব এবং কৈশোরের ক্রীড়াঙ্গণ হিসেবে এই লাহাবাগানের খেলার মাঠ পরিচিত। লাহা বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রত্যক্ষ তত্ত'বধানে দশকের পর দশক ধরে এই উদ্যান লাহাবাগান খেলার মাঠে অসংখ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং ফুটবল, ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলার আদর্শ অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। অনেক কৃতী ফুটবলার এই লাহা বাগান খেলার মাঠ থেকে কোলকাতা তথা ভারতে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। এলাকার মানুষের দাবীমত এই বাগানের ১৫ বিঘা নিষ্কর জমিকে খেলার মাঠ হিসেবে ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের স্বীকৃতিও দিয়েছে। সম্প্রতি প্রোমোটার চক্র, রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসনের অশুভ আঁতাতে এই বাগানের মধ্যে অবস্থিত ৩টি পুকুর বুজিয়ে এবং জমির বেআইনী রূপান্তরের মাধমে একটি বেসরকারী স্কুলের অবৈধ নির্মাণ কাজ চলছে। এলাকার বিশিষ্ট আইনজীবি এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী তপন কুমার রায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এ পি ডি আর পানিহাটী শাখার সহযোগিতায় এই খেলার মাঠ পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চলছে। আইনের সমস্ত দিক উল্লেখ করে এবং জমির আইনী নথি যুক্ত করে বিষয়টিকে প্রশাসনের সর্বস্তরে জানানো হয়েছে। এমনকি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থানে গিয়ে ২০১৬ সালে এই অবৈধ নির্মাণ সম্পর্কে অভিযোগ জানানো হয়। তৎক্ষণাৎ ঐ বেআইনী নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও সাময়িক বন্ধ থাকার পর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই অবৈধ কাজ চলতে থাকে। প্রসঙ্গত যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াকে অনুসরণ না করে এবং বিবাদী পক্ষ হিসেবে লাহাবাগান স্পোর্টিং ক্লাবকে সাধারণ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করে ও তাঁদের বক্তব্য না শুনে ও আইনী নথি না দেখে একতরফা ভাবে মহামান্য কোলকাতা উচ্চ আদালত আবেদনকারীর পক্ষে রায় দেন কারণ বেআইনী নির্মাণকারীরা আদালতকে প্রকৃত তথ্যগত দিক থেকে অন্ধকারে রেখেছিলো। আদালত পুলিশের সহযোগিতায় সীমানা প্রাচীর দেবার নির্দেশ দেয়। অথচ অপর একটি মামলায় (এই বিবাদকে কেন্দ্র করেই) লাহা বাগান স্পোর্টিং ক্লাবের আবেদন মহামান্য কোলকাতা হাইকোর্ট শুনতেই চাইনি এবং এটাকে দেওয়ানী মামলা হিসেবে সংশ্লিষ্ট আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দুর্ভাগ্য বশত মহামান্য আদালতের এই রায়ে লাহাবাগান স্পোর্টিং ক্লাব দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবে অর্থবলে বলীয়ান এবং প্রভাবশালীদের দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণকারীদের কাছে সাময়িকভাবে পরাস্ত হয়। কিন্তু আপোষহীন যোদ্ধা তপন কুমার রায়ের দৃঢ়তা এবং সংকল্পের জন্য এই আন্দোলন মানুষের মাঝে এখনও সজীব। পানিহাটী এ পি ডি আর -এর সক্রিয় সহযোগিতায় আধিপত্যবাদী শক্তির সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চলছে। অধিকার আন্দোলনের নির্ভীক যোদ্ধাদের বিশ্বাস স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা বজায় থাকলে শিশুদের খেলার মাঠ পুনরুদ্ধার করা যাবে।

'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢেকে'
গত এক বছরে পানিহাটী শাখার পাঁচজন প্রবীণ সদস্যের প্রয়াণ।
শোকস্তব্ধ শাখার পক্ষ থেকে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি পানিহাটী শাখার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক সাথীকে আমরা অসময়ে হারিয়েছি। সমকালে সেই নির্ভীক, আপোষহীন যোদ্ধা সাথীদের স্মরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তাঁদের অসমাপ্ত কাজ কম্পন্ন করার। 'না ফেরার দেশে' চলে যাওয়া সাথীদের সরণী ছিলো দীর্ঘ। সাথী স্বপন মজুমদার, মণিদা, অর্চনা, পীযুষ রুদ্র, সমীর গুহ ও অমিত চট্টোপাধ্যায়। এবার খুব অল্প সময়ে (মাত্র ১ বছরের মধ্যে আমাদের শাখার ৫ জন সক্রিয় সদস্যকে আমরা হারিয়েছি। গত ১০ই ডিসেম্বরে ২০২১ প্রয়াত হয়েছেন শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক, সমাজসেবী, দেশের অন্যতম অগ্রণী সমাজবাদী নেতা, গণ আন্দোলনের সংগ্রামী যোদ্ধা ও আজীবন সংগ্রামী ডা সন্মথনাথ ঘোষ। গত জুলাই মাসে হারিয়েছি শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রয়াত সাথী শ্যামল মুখোপাধ্যায়কে এবং অতি সম্প্রতি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অধিকার আন্দোলনের অপর সহকর্মী সাথী দিলীপ ঘোষ। মানবাধিকার সংগ্রামের এই যাত্রাপথে শাখা হারিয়েছে আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে সাথী সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং দেবকুমার সাহাকে। একের পর এক সাথীহারা আমাদেরকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে। তবে অধিকার আন্দোলনে তাঁদের আপোষহীন সংগ্রামের জীবন আমাদেরকে মানবাধিকার রক্ষার লড়াইয়ের ময়দানে অবিচল থাকার প্রেরণা যোগাবে। গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্রয়াত শ্যামল মুখার্জীর স্মরণ সভায় সমিতির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক এবং শাখার সভাপতি ধীরাজ সেনগুপ্ত এবং অন্যান্য সদস্য এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের আমন্ত্রিত সদস্যরা তাঁর জীবন এবং সংগ্রামের স্মৃতিচারণা করেন। উপস্থিত সকলে বাকরুদ্ধ হয়ে তাঁর অকৃতদার জীবনে ত্যাগের কাহিনী শুনে শোকাপ্লুত হয়। গত ১লা জানুয়ারী ২০২২ শাখার কার্যালয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডা সন্মথনাথ ঘোষ এবং অপর দুই সদস্য দেবকুমার সাহা এবং সন্তোষ ভট্টাচার্যের স্মরণ সভায় তাঁদের সংগ্রাম-সমৃদ্ধ জীবনের স্মৃতিচারণায় সভা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি (০৪/০৯/২০২২ সাথী দিলীপ ঘোষের স্মরণসভায়ও শোকের একই আবহ ফুটে উঠেছিলো। প্রতিটি স্মরণেই শাখার সদস্যদের মধে বিশ্বকবির অন্তিম ভাবনা উপলব্ধ হয়েছে,

'মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।'